ভূমিকা

লেখিকাকে আগে জানতাম না ; জানলাম এই লেখার মধ্য দিয়ে। মন্তেসারি প্রণালীর শিক্ষণ সম্পর্কে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। অবসর মতো নানা অনুষ্ঠান ও ইউরোপের নানা জায়গায় ঘুরেছেন তাঁর মন মুক্ত, দৃষ্টি সন্ধানী—তারই জন্ম আমরা পশ্চিমের এই স্বচ্ছ পরিচায়িকাটি পেয়ে গেলাম—তার গ্রামের, শহরের, প্রকৃতির, মানুষের,—বিশেষ করে মানুষের।

কূপমাণ্ডুক্য বজায় রাখতে কেউ কেউ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চোখ বুজে থাকা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। চোখ খুললেই দেখতে হবে স্বাতন্ত্র্যের পাঁচিল ভেঙে গিয়ে চতুর্দিক একাকার। বিচ্ছিন্ন একক হয়ে আর বাঁচবার জো নেই। জীবনধর্মের এই রূপান্তর সহজে মেনে নেওয়া মুশকিল। সংঘর্ষের তাই অবধি নেই। দুই মতবাদ পরস্পরের দিকে চোখ পাকিয়ে আছে। আমাদের দেশে অবস্থাটা ইউরোপের মতো অতদূর প্রকট নয়। সাধারণ মানুষ দিশা হারিয়ে ফেলে, ভুল বোঝাবুঝির অন্ত নেই।

বইখানিতে গুণী-জ্ঞানী-মহাজনেরা তেমন নন—ঐ সামান্য সাধারণেরা ভিড় করে আছে তাদের ঘরোয়া কথাবার্তা ও আটপৌরে স্বভাবচরিত্র নিয়ে। লেখিকার দেখা দেশগুলোয় আমি যাই নি, কিন্তু এখন আর বলতে পারিনে অচেনা জায়গা। 'বিলেত দেশটা মাটির'—সেই মাটির গন্ধ পাই যেন লেখায়। বিশেষ রকম পারিপাট্য বা বাগ্‌বাহুল্য নেই। তাই ওদেশের মানুষগুলো আত্মীয়জনের মতো সহজভাবে মনের ঘরের মধ্যে উঠে বসে।

মনোজ বসু

২১-৯-৫৩

সন্ধানীর চোখে পশ্চিম

নূতন দেশে গেলেই নানা স্তরের লোকের সংগে আলাপ পরিচয় করার আগ্রহ হয়। প্রবাসে স্বদেশবাসীর সংগে আলাপ করার চেয়েও বিদেশীর চোখে আমাদের স্থান কোথায়, তার সন্ধান নেবার ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই আলাপ করেছি ছাত্র, অধ্যাপক, মজুর, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, বড়লোক এবং শাসক-গোষ্ঠীর নানাজনের সংগে। চেষ্টা করেছি তাদের কাছ থেকে জানতে আমরা কোন পর্যায়ভুক্ত। সাধারণ লোকের কাছ থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার কোনটা তিক্ত, কোনটা মিষ্ট, কোনটা বা অম্লমধুর। ইংল্যাণ্ড এবং পশ্চিম-ইউরোপ সর্বত্রই সাধারণ মানুষের দুটো শ্রেণী—এক প্রগতিপন্থী আর এক সাম্যবাদবিরোধী। এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন বিশেষ স্তর নেই। অবশ্য মাঝখানে মানুষ আছে অনেক, কিন্তু তারা জানে না তাদের মতামত কি।

সাধারণ ছাত্রসমাজ (যারা সাম্যবাদী নয়) তারা জানে ভারত একটা উপনিবেশ, খালি দুর্ভিক্ষ আর জনবৃদ্ধিই এর বৈশিষ্ট্য ; অতি কুসংস্কার আর বর্বরতায় ভরা সে দেশ। তাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়ানো হয় অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ। একটি ছোট মেয়ে—বয়স তার এগারো বছর, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কখনও ভারতবাসী দেখেছ ?" "দেখেছি"—বলে চলল সে,—"কিন্তু তুমি ত কই, বইতে যেরকম লেখে সেরকম নও ? তুমি ত নোংরা আর বিশ্রী কালো নও ? তোমার যে ছেলে আছে' তাকে কি তুমি জলে ভাসিয়ে দিতে গিয়েছিলে ? আমাদের দেশের লোকেরা তোমাদের দেশে না গেলে

তোমাদের কি হ'ত বল ত ?" তারপর অন্ধকূপ হত্যার বিবরণটা বলে সে বলল—"তোমার দেশের লোকেরা কি সাংঘাতিক বল ত ? এতগুলো লোককে এমনি করে মেরে ফেলল ?"

বেচারার এতগুলো প্রশ্নের তাড়ায় খানিকক্ষণ হকচকিয়ে গেলাম। তারপর যখন ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলাম এর কোনটা মিথ্যে, কোনটা আংশিক বিকৃত সত্য, তার চোখে তখন নেমে এল অবিশ্বাসের ছায়া। সে এগারো বছর বয়সে স্কুলপাঠ্যকে বেদ বলে জেনেছে ; আজ আমি এক অসভ্য দূর দেশ হতে গিয়ে যদি ওদের বলি, "তোমার দেশের লোকেরা মিথ্যা বলে," তা'হলে বিশ্বাস হবে কেন তার ? তবে তার দৃঢ়বিশ্বাসের মূলে চিড় ধরেছে—সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বড় হয়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্যিকার ভাল লোকের লেখা বই পড়বে, আর যতদূর সম্ভব নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সব বিষয় জানার চেষ্টা করবে।

যারা স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছে উচ্চতর শিক্ষার ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে, যারা আজ বাদে কাল শিক্ষক হয়ে ভাবী নাগরিকদের করবে শিক্ষিত—তাদের মনোভাব আরও বিকৃত, আরও অনুদার। ১১।১২ বছরের ছাত্রছাত্রীকে যা পড়ানো হয় তাই তারা শেখে। কিন্তু ১৮ থেকে ২৫।৩০ যাদের বয়স তাদের মধ্যেও বাসা বেঁধে আছে প্রগাঢ় রক্ষণশীলতা। বোর্ডিংএ যারা বাস করতে আসে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই খেটে খাওয়া বুদ্ধিজীবীদের জাত (আমাদের দেশের নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংগে তার তুলনা চলে, যদিও ইংলণ্ডে এবং ইউরোপে "মধ্যবিত্ত" বলতে আমাদের বড়লোকশ্রেণী বোঝায়)। প্রত্যেকেই শিক্ষা শেষ হলে চাকরী করবে, হাতে কিছু টাকা জমলে বিয়ে করবে, তারপর প্রয়োজনমত টাকার সংস্থান হলে ছেলেমেয়ে জন্মানোর দায়িত্ব নেবে, আর নয়ত একটি মোটরগাড়ী এবং বাড়ী

করবে। এই এদের জীবন—ছকে বাঁধা আর ছাঁচে ফেলা। প্রতিটি পাই খরচা করার আগে ওরা হিসেব করে—তা করার মত আয় এবং পারিপার্শ্বিক তার সহায়ক কিনা। তার ফলে আয় বুঝে ব্যয় করার অভ্যাস গড়ে ওঠে ছোটবেলা থেকেই ; মাঝে মাঝে তার মাত্রা ছাড়িয়ে সংকীর্ণতাও এসে যায়। চাকরী পাওয়ার সংগে সংগেই মা বাবাকে আহার ও বাসস্থান বাবদ একটা সাপ্তাহিক দক্ষিণা ধরে দেবে। গোটা সংসার তার মাথায় আসে না, আর মা বাবাও তার বেশী আশা করে না। যদি প্রয়োজন মনে করে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকারও তার দাবী আছে, কারণ সে স্বাবলম্বী। বিয়ে করার পর আলাদা বাড়ী করাটা অবশ্য কর্তব্য ; কারণ মা বা মেয়ে, শাশুড়ী বা বউ, কেউই কারোর কর্তৃত্বাধীন থাকতে রাজী নয়। স্বামী স্ত্রীতে মিলে নূতন সংসার নিজেরা গড়ে তুলবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। নিতান্ত নিরুপায় না হলে মা কিংবা মেয়ে, ভাই কিংবা বোন, বাবা অথবা শাশুড়ী কেউই তাদের দ্বারস্থ হবে না। উপার্জনহীন হলে তাদের কাছে আর্থিক সাহায্য কামনা করতে পারে আর তারাও সাধারণত সাহায্য করে থাকে ; সেটা প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই কর্তব্য। স্বামী স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে মিলে সুখী পরিবার গড়ে তোলাটা এদের লক্ষ্য। অবশ্য সে লক্ষ্যে কতটা পৌছায় তা বিচারসাপেক্ষ। লোকের সংগে মেশে এরা কম। সাপ্তাহান্তিক ছুটি ভোগ করার জন্য মাঝে মাঝে হয়ত আত্মীয়স্বজনের আতিথ্য নেয়, তারপর ফিরে আসে আবার রুটিনবাঁধা কাজে। একটা প্রবাদ আছে—"An Englishman's home is his own castle"—স্বাভাবিক নিয়মে এই দুর্গে বাস করাই হোল তার কর্তব্য। সামাজিকতা আর লোকলৌকিকতাও নিতান্ত কম। বৎসরান্তে একবার ক্রীশমাসের কার্ড পাঠিয়ে বা জন্মতিথিতে

কিছু উপহার পাঠিয়ে মনে করে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে। আমাদের মত অলস পরচর্চায় কাটাবার সময়ের ওদের বড় অভাব।

ফলে সমাজ এবং বাইরের জগতে মেশে না এরা মোটেই। আর কালা আদমী বলে আমাদের ত কথাই আলাদা। যারা প্রাচীনপন্থী তারা আমাদের মনে করে মেশার অযোগ্য, আর যারা নবীনপন্থী তারা জানে ভারতীয়েরা অত্যন্ত রক্ষণশীল, নিজেদের আচার ব্যবহার আর বর্ণবিদ্বেষের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে আমরা ওদের সংগে মিশতে চাই না। তাই প্রগতিপন্থীরাও আমাদের এড়িয়ে যায় সযত্নে। ওদের **superiority complex** আর আমাদের **inferiority complex** এ দুয়ের ধাক্কায় প্রথম খুঁজেই পাই নি মিশব কার সংগে, কি নিয়ে আলাপ করব। তাই অভিনয় করেছি নীরব দর্শকের ভূমিকা।

এগিয়ে এল ইংল্যাণ্ডের ১৯৫১ সালের ইলেকসন। দেশে প্রবল উত্তেজনা। দুটি মেয়ে বিশেষ করে আগ্রহান্বিত। তাদের এই প্রথম ভোট দেবার অধিকার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকে ভোট দেবে?"

সে বলল, "কেন? কনসারভেটিব গভর্ণমেণ্ট চাই আমরা।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? আমার বাপঠাকুর্দা চিরকাল ওদের ভোট দিয়ে এসেছে। ওদের হাতেই ত আমাদের দেশের মংগল। লেবার গভর্ণমেণ্ট ত দেশটাকে প্রায় ডুবিয়ে দিতে বসেছে।"

"কেন? উপনিবেশগুলি স্বাধীন হচ্ছে বলে?"

বোঝা গেল সরাসরি প্রশ্নে বেচারা বড় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বলল,—"আরে না না। তোমরা স্বাধীন হও সে ত ভাল কথা। কিন্তু দেখ দেখি, চারদিকে খালি ধর্মঘট। কতগুলো শিল্প-

প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে। ফলে কেউ আর কাজ করে না; বসে বসে শুধু মাইনে নেয়। এদিকে দেশে টাকা নেই, দেশের কি দুর্দশা বল দেখি?"

"তাহলে দেশের দুর্দশা তুমিও স্বীকার কর, উন্নতির চেষ্টা করনা কেন?"

"তার জন্যই ত চার্চিল সরকারকে ক্ষমতা দেবার চেষ্টা করছি।"

এই হল বহু সাধারণ ইংরেজ ছাত্রছাত্রীর মনোভাব।

শেষ হল ইলেকসান, চার্চিল সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। দুমাসও কাটল না—দুবার ট্রেন ও বাসভাড়া বাড়ল, কয়েকটি জিনিসের বরাদ্দ কাটা হল, আরও দু'একটি স্টেশনারী জিনিষের দাম বাড়ান হল। একদিন খাবার টেবিলে আবার পাকড়াও করলাম সেই ছাত্রীকে।

"তোমরা চার্চিলকে চেয়েছিলে, তিনি ত তোমাদের এই দিয়েছেন। এর পরেও কি বলবে তোমরা তার কাজে খুব তুষ্ট?"

"কিন্তু চার্চিলের কি দোষ, দেশের টাকা নেই; সরকারের খরচ চলে না, ট্যাক্স ত আমাদের দিতেই হবে।"

"দেবে কোত্থেকে, মাইনে কারো বেড়েছে?"

এবার বিরক্ত হয়ে সে বলল "শুনছ বলছি সরকারের টাকা নেই, মাইনে বাড়াবে কি করে?"

নাছোড়বান্দার মত তবু বললাম,—"তা ট্যাক্স ত ঐ মাইনে থেকেই দিতে হবে, খাবে তবে কি? জিনিসপত্রের দামও ত ঐ মাইনে থেকে দেবে, সে দামও যে বেড়েছে।"

এবার সে বলল,—"তুমি ত এদেশে ছিলে না, তাই জান না—লেবার গভর্ণমেণ্ট আমাদের দেশকে দেউলে করে দিয়ে গেছে। তখন আমরা চুপ করে এই অন্যায় সহ্য করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের

করতেই হবে। আমাদের দেশকে আবার স্বচ্ছল করে তুলতে হলে আমাদের এ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। চার্চিল বিচক্ষণ লোক; তাঁর বুদ্ধি আমাদের যেদিকে চালাবে আমরা সেদিকেই চলব। লেবার গভর্নমেণ্টের ভুল শোধরাবার দায়িত্ব আমরা দিয়েছি টোরী গভর্নমেণ্টকে, আমাদের কাজ শুধু ওদের মেনে চলা।"

"আচ্ছা, টাকা নেই বলছ—তা আর একটা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জায় ত মেলাই টাকা খরচা হচ্ছে—সে টাকাটা ত দেশের পুনর্গঠনে লাগালে পার?"

"তা কি করে হবে? যুদ্ধ বাধলে তার থেকে বাঁচার উপায় করতে হবে না?"

"যুদ্ধ যে বাধবেই একথা কে বলল? তাছাড়া দু' দুটো যুদ্ধ ত দেশের উপর দিয়ে গেল, উন্নতি ত কিছুই হোলো না তাতে। লাভের থেকে দেশটা আর রইল না। যুদ্ধ যাতে না বাধে তার চেষ্টা কর না কেন?"

"আমরা কি যুদ্ধ চাই? আমাদের দেশের ছেলেরা ত সব মারা পড়েছে, চারদিকে হাহাকার উঠেছে। কিন্তু রাশিয়া যে কিছুতেই শুনবে না, সে আমাদের সংগে শান্তিচুক্তি করবে না। সে শীগগিরই আসছে আমাদের দেশ আক্রমণ করে সবাইকে কম্যুনিস্ট করার জন্য।"

আমি বললাম—"সে আবার কি জিনিস?"

"তা কি আমরা জানি? রাশিয়ার কিছু কি জানা যায়? সবই তার লৌহযবনিকার আড়ালে। তবে এই জানি—কম্যুনিস্টরা বড় সাংঘাতিক লোক। তারা যুদ্ধবন্দীদের ধরে নিয়ে বন্দীশিবির আর লবণখনিতে পাঠিয়ে দেয়, সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। আর তারা চারদিকে যত চর রেখেছে—যত দেশের গোপন খবর

জানার জন্য। সে সব খবর নিয়ে এই দেশদ্রোহীরা রাশিয়াকে দেয়। রাশিয়া তার দেশের লোকগুলিকে মেশিনের মত কাজ করিয়ে তৈরী করেছে গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র আর সৈন্যসামন্ত। এদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে চাই আমাদেরও প্রস্তুতি। তাই আমরা কষ্টস্বীকার করেও দেশকে বাঁচাব।”

নিতান্ত আগ্রহভরে তার কথা শুনছিলাম, থামলে জিজ্ঞাসা করলাম—“আচ্ছা রাশিয়ার যদি এতই শক্তি, তাহলে তোমাদের সে এখনও আক্রমণ করছে না কেন? তোমরা প্রস্তুত হওনি বলে?”

এবার সে আমার ব্যংগের স্বর ধরে ফেলল। বলল—“তুমি খুব নিশ্চিন্ত আছ—আর আজ হাসছ। কিন্তু তোমার দেশ যদি আজ রাশিয়া আক্রমণ করে তাহলে কি হবে? এখন ত আর আমরা নেই তোমাদের দেশে যে তোমাদের বাঁচাব।”

আমি বললাম—“সে জন্য দুঃখ করো না। আমাদের দরকার হলেই তোমাদের ঠিক ডেকে নেবার জন্য আমরা তৈরী আছি। আর আমাদের খবরদারী করার জন্য তোমাদের কিছু লোক ওদেশে আছেও। তারপর আছে আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা। তোমরা এই দু'দল মিলে আমাদের কি আর একেবারে অরক্ষিত করে রাখবে? আমাদের সরকার নিরপেক্ষ; তোমাদের সাহায্য নিতে ত আমাদের আপত্তি নেই।”

সেদিনকার মত বেচারাকে রেহাই দিলাম। তবে প্রায়ই তার সংগে আমার নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা হত। তার ফলে আমার দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়ে একদিন জিজ্ঞেস করলে,—“আচ্ছা তুমি ত আমার দেশকে মোটেই দেখতে পার না?”

বাধা দিয়ে বললাম—“কে বললে তোমার দেশকে আমি দেখতে

পারি না? সেই সাত হাজার মাইল দূর থেকে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে তোমার দেশে এসেছি শুধু কি বেড়াতে? তোমার দেশের লোকেরা কি রকম, কি তাদের দৃষ্টিভংগী, আমাদের দেশের লোকের থেকে তোমরা কি অংশে উন্নত, এবং কি কারণে আর কি গুণে তোমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব করেছ তার সন্ধান নিতে এসেছি। আর তোমাদের অর্থাৎ বিলাতের সাধারণ মানুষের উপর ত আমাদের কোন রাগ নেই কোনোকালে। রাগ আমাদের যারা শাসন আর শোষণ করেছে, আর শোষণ করার জন্য করেছে অত্যাচারের চরম, তাদের উপর। নাহলে তোমাদের সংগে আমাদের তফাৎ কোথায়?"

"কেন তোমাদের দেশে ত মেলাই ইংরেজ রয়েছে, তাদের দেখে কি বোঝ না আমরা কি রকম?"

এবার আমি হেসে বললাম,—"ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানা ছবি বেরিয়েছে, নাম তার 'রিভার'—খুব সুখ্যাতি শুনবে তার। ভালো করে বলা হয়েছে—ইংরেজ কত কষ্টেই না ওদেশে আছে। ছবিখানা দেখে এসো, তা'হলে বুঝবে বিদেশীরা আমাদের দেশে কি করে বাস করে। আর শুধু আমাদের দেশেই বা কেন? তোমাদের দেশেই ত চলতি প্রবাদ 'ইংরাজ তার গৃহদুর্গে বাস করে'। ওরা হ'ল শাসক-গোষ্ঠী, শাদা জাত, আমাদের থেকে অনেক উন্নত; আমরা কালা আদমী আর নিকৃষ্ট জাত। আমাদের সংগে সম্পর্ক খালি 'আমাদের মানুষ করা'—আমরা তাকে বলি অত্যাচার চালানো আর শোষণ করা। তারই অংগ হিসাবে এদেশে তোমাদের মত অন্ধদের কাছে এইসব প্রচারও তারা চালায়।"

"আমরা ত জানি,—তোমাদের উন্নত করার জন্য আমাদের দেশের লোকেরা কত না পরিশ্রম করেছে, বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছে,—

রেল, তার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি চালিয়েছে। এগুলো কি তুমি অস্বীকার কর ?"

"অস্বীকার করি না, তবে কথাগুলো বিকৃত সত্য। কারণ আমাদের দেশে বিদ্যুৎ আর নূতন আবিষ্কারগুলো চালু করেছে তোমাদের শাসকগোষ্ঠী, তাড়াতাড়ি আমাদের উন্নতির জন্য নয়—ওদেশে বিপ্লব দমনের জন্য। অর্থাৎ শাসন কায়েমী রাখার জন্য। তাড়াতাড়ি খবর পাওয়া যাবে, এবং সৈন্যসামন্ত তাড়াতাড়ি পাঠান যাবে—এ দুয়ের জন্যই এর প্রয়োজন। তাছাড়া রেল বিদ্যুৎ এসব হলে দেশটা থেকে পুরোপুরি প্রচুর মুনাফা লুট করে আনার সুবিধা। আমাদের দেশে ত বিজ্ঞানীর অভাব নাই—তারা আজ কিংবা কাল এগুলো চালাতই। আর কালা আদমীরাও অনেক দেশে রেল, তার, বিদ্যুৎ তৈরী করেছে। ইংরাজরা যদি সম্ভব মনে করত, তাহলে দেশে ফেরার সময় এগুলো মাথায় করে নিয়ে আসত—যেমন নিয়ে আসছে তাদের লগ্নী মূলধন দেশীয় সরকারের জাতীয়করণের ভয়ে। উন্নতির কথাই বলি—তোমাদের ত দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের তোমরা মেলাই 'উন্নতি' করেছ। বেশ, শুধু এই কথাটার জবাব দাও—পৃথিবীতে সবথেকে উর্বর দেশ ছিল ভারতবর্ষ। দু'শ বছর ইংরেজশাসনের পরে প্রতিবছর দুর্ভিক্ষে সেদেশে লোক মরে কেন ? তোমাদেরই পুরনো লেখকদের লেখা থেকে পড়ো,—কেমন করে তোমরা আমাদের শিল্প নষ্ট করেছ। আর অত্যাচার ? তার কথা নাই বা বললাম। তোমাদের এডমণ্ড বার্ক যে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত করেছিলেন তার বিবরণ কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের অল্প লোকের জানা আছে। ক্লাইভের অত্যাচার, নীলকরদের শোষণ কিছুই কি তোমরা পড়নি ? স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের দেশের ভাল ভাল ছেলেদের বুদ্ধিশক্তি নষ্ট করার

হয় কি করে তাদের মাথায় Injection দেওয়া হোত সে খবর আর নাই বা বললাম। তোমরা 'মাদাম ত্যুসোর' একতলায় খাঁচায় বন্ধ করে চাবুকমারার মূর্তি দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাও, মেদিনীপুর আর কাঁথি, চট্টগ্রাম আর কুমিল্লা, ময়মনসিংহ আর ঢাকার অত্যাচারের কথা শোনার মত শক্ত স্নায়ু তোমাদের হবে না"—ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলাম, তাই হঠাৎ চুপ করে গেলাম।

সে খুব অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল, "আমার দেশের লোকেরা এইসব করেছে, তুমি সুস্থমস্তিষ্কে এইসব বলছ?"

আমি বললাম, "সুস্থমস্তিষ্কে এবং পরিপূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই বলছি। হয়ত তোমরা আপত্তি করতে পারো বলে তোমাদের রেখেছে অন্ধকারে।"

এবার তার মুখে দেখা গেল চিন্তার রেখা। ২৫ বছরের জমান অবিশ্বাসের মূলে যেন ফাটল ধরেছে।

গেল এই ছাত্রীটি। আর একটি মেয়ের সংগে কথা হল। একুশ বাইশ নয়, বয়স তার বছর ৩২। আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের দেশে গেলে আমরা চাকরী পাব?"

আমি বললাম,—"আলবৎ পাবে। তোমরা শাদা জাত দয়া করে আমাদের দেশে যাবে—আর আমরা একটা চাকরী দিয়ে তোমাদের উপকার করতে পারব না? আমরা কি তোমাদের মত অকৃতজ্ঞ? আমি এতদূর দেশ থেকে এসেছি, তাও ঘরের পয়সা তোমাদের দিয়ে যেতে—তবু তোমরা ভাব জমাতে চাও না।"

সে বলল,—"তোমার যা মুখ খুলেছে স্বাধীন হয়ে—তবুও ত এখনও কমনওয়েলথের অধীন আছ?"

"সাধ করে কি আর আছি, পারলে কবেই ছুটে পালাতাম।"

"তোমাদের মতন লোকের জন্যই তোমার দেশের ভাল লোকেরা আমরা চলে আসায় খুব দুঃখিত হয়েছে।"

"তা হয়েছে বুঝি!"

খুব হাসছি দেখে সে বলল,—"সত্যি বল না—আমরা চলে আসায় তোমরা খুশী হয়েছ?"

"তোমার কি মনে হয়!"

"তা কি জানি! কত লোক ত কত দুঃখ করে, আমরা চলে আসায় তোমরা দাংগা করে মরছ, এখনও তোমরা স্বাধীন রাজ্যলাভের উপযুক্ত হও নি।"

"স্বাধীন হবার সকলেরই অধিকার আছে। এইমাত্র 'কমনওয়েলথে' আছি বলে না এমন গাল দিলে। তাও ত অফিসিয়ালি আমরা তোমাদের সংগে সমপর্যায়ভুক্ত। (India is a member in the Commonwealth of Nations of which Britain is a member although she is the head of the Commonwealth) তা আমার গায়ে লাগল হয়ত খানিকটা স্বাধীন হয়েছি বলেই। না হলে আমাদের ছেলেমেয়েরা 'ব্রিটিশপ্রজা' হিসাবে কি করে তোমাদের দেশে বাস করে গিয়েছে, আর ফিরে গিয়ে তোমাদেরই করেছে নকল—তা'ই অবাক হয়ে ভাবি।"

এবার সে গর্বের সংগে বলল,—"ব্রিটিশ প্রজা হওয়া গৌরবের কথা।"

"ব্রিটিশের পক্ষে, আমার পক্ষে নয়। তুমি কি খানিকটা রাজনীতি আলোচনা করতে চাও?"

অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং গর্বের সংগে সে বলল,—"আমরা ব্রিটিশ ছাত্র-ছাত্রীরা রাজনীতি আলোচনা করে সময় নষ্ট করি না।"

আমি বললাম,—"সেই ভাল। ক্লাশেরও সময় হয়ে এল, চল কমনওয়েলথবাসীর সংগে ক্লাশ করবে।"

এই হোল সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও তরুণীদের মনোভাব। এরা সাধারণত 'রাজনীতির কথা' ভাবে না—যথানিয়মে ভোট দেয়।

কিন্তু সাধারণের মধ্যেও কোন কোন ছেলেমেয়ে আছে তারা রাজনীতির কথা ভাবে। এদের সেই বিপরীত দিকটা দেখেছিলাম শেফিল্ড শহরে যখন ১৯৫২ সালের জুন মাসে সারা ইউরোপের তরুণতরুণীর দল জমায়েত হয়েছিল "শান্তি সম্মেলনে"র উদ্দেশে। কয়েকজনের কাছ থেকে জরুরী খবর এল, "চল দেখে আসি বৃটেনের ছাত্রছাত্রীদের সম্মেলন।" হতাশার সুরে বললাম—"কি আর দেখব, ও ত জানাই আছে। গোটা ৫।৭ ছাত্রছাত্রী হয়ত খানিকটা পাগলামী করবে—তারপর বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবে জনতার মহাসমুদ্রে।" তবু কেন জানি না, লণ্ডন থেকে আর ১৫০০ ছাত্রছাত্রীর সংগে একদিন কোচে চেপে বসলাম।

সারা রাস্তা হৈ চৈ আর আলাপ-পরিচয়ের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে যখন শেফিল্ডএর প্রান্তরে নামলাম, ভোর তখন সাড়ে ছয়টা। মাঠের উপর যেদিকে তাকাই তাঁবুর পর তাঁবুর সারি। তার প্রত্যেকটার নম্বর আর নামের সংগে পরিচয় করে সে বেলাটা কাটল। আমাদের কাছে এ দৃশ্য অদৃষ্টপুর্ব। তাই যখন খাবার তাঁবুর সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম—চারদিকে চোখ মেলে তাকাবার অবসর মিলল। পাণ্ডববর্জিত ঐ শেফিল্ডের প্রান্তর একহাঁটু লম্বা ঘাস দিয়ে ঢাকা। বৃটেনের বহু পরিচিত বর্ষা। তবু ঐ পাঁচ হাজার যুবকযুবতী-কারো মুখে বিন্দুমাত্র অসন্তোষ নেই। এরা কেউ বা এসেছে আয়ার্ল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড থেকে, কেউ বা এসেছে অষ্ট্রিয়া, জার্মাণী থেকে, অস্টেলিয়া, আমেরিকারও

আছে কেঁউ কেউ। ফ্রান্স আর সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি পশ্চিম-ইউরোপের ছেলেমেয়ে সবাই এরা মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। উচ্ছ্বাস আর প্রাচুর্যে ভরা এই সম্মেলন যেন ব্রিটিশ ছাত্রসমাজের আর একটি দিক দেখাল আমাকে। শুনেছি সারা বৃটেনের ইতিহাসে এরকম নাকি আর কখনও হয় নি। এই পাঁচ হাজার শান্তিসেনার মিলিত অভিযান বৃটেনের ভাবী ইতিহাস রচয়িতাদের যোগাবে রসদ। এরা আর কিছু চায় না, পৃথিবীকে জানাতে চায়· এরা চায় শান্তি। বোমাবিধ্বস্ত শেফিল্ডের প্রধান রাস্তা দিয়ে যখন এই শান্তিযোদ্ধারা মিছিল করে যাচ্ছিল তারা চীৎকার করে বলছিল,—"আমরা চাই শান্তি, চাই বন্ধুত্ব"—রাস্তার দুপাশের জনতা অবাক হয়ে দেখছিল আর হাত নেড়ে জবাব দিচ্ছিল—"বন্ধুত্ব"। অনেক বৃদ্ধবৃদ্ধা,—কারোর হয়ত ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে, কারোর স্বামী,—এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করে বলল,—"আমরা আর যুদ্ধ চাই না। তোমাদের উপর আমরা ভরসা রাখি, তোমরা দেশে দেশে তোমাদের আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুদের কাছে প্রচার করবে—'আমরা শান্তি চাই'। সকলে মিলে একসংগে শান্তি চাইলে যুদ্ধ ঠেকানো যাবে।" রণক্লান্ত শেফিল্ডের বুকের উপর এই শান্তিসম্মেলন তাই বহু মূল্যবান।

শোভাযাত্রা বা সভা আমাদের চোখে নূতন কিছু নয়। কিন্তু এটাই আশ্চর্য যে এরাও এইরকম ভাবে। এতকাল যত ইংরেজ ছেলেমেয়ের সংগে আলাপ পরিচয় হয়েছে তারা সবাই আমাদের সঙ্গে একমত নয়। ভালোমন্দ, বুদ্ধিমান, নির্বোধ সবই আছে তাদের মধ্যে। কিন্তু এমন গতানুগতিক ছকে বাঁধা জীবন তাদের যে বুঝে উঠতে পারি না এরা কোনদিন স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন জিজ্ঞাসা করে। এমন চিন্তার সার্থক 'রেজিমেণ্টেশন' বুঝি কোনো দেশে করা

যায় না—'গণতন্ত্রের' এই ব্রিটিশ ভাঁওতা না হলে কি এটা সম্ভব হত? তাই যখন দেখলাম বিভিন্ন জাতি আর বর্ণবিদ্বেষের বাধা এড়িয়ে পথের সাধারণ মানুষ আর শ্রমিক, ছেলে আর বুড়ো সবাই সাড়া দিয়েছে—এই শান্তির ডাকে, এগিয়ে এসে করেছে সাহায্য,—মনে হলো এদেশে আসা আমার ব্যর্থ হয়নি, ভারতীয় শোষিত সমাজের চিরন্তন বর্ণবিদ্বেষ এবার সমূলে হয়েছে উৎপাটিত। এতকাল মনকে চোখ রাঙিয়ে বলতে হত—"বড়লোক যেমন সবাই সমান, তেমনি সাধারণ মানুষও সবাই সমান—শাদা কালো হলুদ সবই এক"। সে বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ়তর হল শেফিল্ডে—এটাই শেফিল্ড সম্মেলনের পরম মূল্যবান অভিজ্ঞতা।

একদিন খাবার টেবিলে ছাত্রী, অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকার সাক্ষাৎ আর আলাপ করার সময় কি খেয়াল হ'ল বললাম,—"আমি জার্মানী যেতে চাই। আমার ভিসা আছে, কিন্তু কেবলমাত্র তাই কি যথেষ্ট?"

অধ্যাপিকা বললেন,—"হ্যাঁ।"

"বার্লিনেও?"

"বার্লিনের ইংরেজ অধ্যুষিত অঞ্চলেও যেতে পার, তবে মিলিটারী পারমিট লাগবে।"

"আর তার চেয়ে বেশী গেলে?"

চারদিকে অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল—"তোমার কি মাথা খারাপ?" "সেখানে কি কেউ যায়?" "কেন বিদেশে প্রাণটা হারাবে?"

আমি ত মহা আশ্চর্য হয়ে বললাম—"কেন?"

এবার বিস্ময়ের পালা ওদের;—"কেন আবার কি? তুমি কি শোন নি রুশশাসিত অঞ্চলে গেলে কেউ ফিরে আসে না?"

"কেন ?"

"কেন আবার কি ? রাশিয়ার লৌহযবনিকার আড়ালে থেকে ফিরে আসা নিতান্ত ভাগ্যের কথা। আর ওদের শাসনে যে যে দেশগুলো আছে সেদেশের অধিবাসীরা কি আর সুস্থ আছে ? দেখ না কেন রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া—এমন কি চীনের বাসিন্দা শুদ্ধ আশ্রয় নিয়েছে ইংলণ্ডে, পশ্চিম ইউরোপে।"

বাধা দিয়ে আমি বললাম,—"কিন্তু আমি ত যতদূর জানি রাশিয়া ওসব দেশগুলো শাসন করছে না ;—ফ্যাশিজ্ম্এর হাত থেকে ওদের মুক্তি পেতে সাহায্য করেছে মাত্র।"

ভদ্রমহিলা খাণিকক্ষণ আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন—"মুক্তিই বটে ! যাও না কিছুদিন থেকে এস না !"

"যাব বই কি,—সুযোগ সুবিধা পেলেই যাব। আর আমি ত ভেবেই পাচ্ছি না—আমি ইংরেজও নই, জার্মানও নই, তবে সোভিয়েট শাসিত দেশগুলোতে গেলে নিরপেক্ষ ভারতবর্ষের লোক আমি আমার কেন জীবন বিপন্ন হবে ?"

একজন অধ্যাপক বললেন,—"ওরা কি আর ইচ্ছা করে করবে ? দেশে যা অরাজকতা চলছে তাতে তোমার জীবনের দায়িত্ব কেউ নেবে না। জীবন বা ধনসম্পত্তি কিছুই সেখানে নিরাপদ নয়।"

যাক্ আমার জার্মানী যাওয়া আর হ'ল না। তবে Iron Curtainএর ফাঁকে কিছুটা সেদিককার আভাস পেয়েছিলাম পরে ভিয়েনায় গিয়ে।

•

ইংল্যাণ্ডে বেশীদিন ছিলাম,—পড়াশুনা করেছি ; তাই তার সম্বন্ধে আমার ধারণাটা অমূলক নয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে আমি

গিয়েছি অনেকটা পথিকের মত—পড়াশুনা করিনি, কিন্তু দেখেছি ও শিখেছি। তাতে করেও আমার মনে হ'ল ইংল্যাণ্ডের মতই ইউরোপের অধিবাসীরাও আজ দু'দলে ভাগ হয়ে পড়েছে। কেউ প্রগতিবাদী, কেউ সাম্যবাদবিরোধী। প্রগতিবাদীদের মধ্যে সবাই যে সাম্যবাদী তা নয়। বরং দেখেছি অনেকে চায় শুধু দেশের শাসন দেশের জনসাধারণ করবে, অন্য দেশের লোকে নয়—এমন কি নিজের দেশের বড়লোকেরাও শুধু নয়। এরা সবাই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, তাতে ভুল নেই। নিজেদের এঁরা গণতন্ত্রী বলেন এবং গণতন্ত্র চান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, গণতন্ত্র চান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও—পোলিটি-ক্যাল ডিমোক্র্যাসি শুধু নয়, ইকনমিক ডিমোক্র্যাসিও চান।

সাম্যবাদবিরোধীরা অবশ্য "টোটালিটারিয়ানিজ্‌ম্"এর বিরোধী—সংঘবাদ চান না। তাদের কাছে তাই হিটলার, মুসোলিনী ও লেনিন-স্তালিনের একদর হবার কথা। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি—তাদের কাছে হিটলার মুসোলিনীর দরটাই বেশী; ফ্যাশিস্ট চর-অনুচর ও নেতা, উপনেতা সেনাপতিরা সাম্যবাদবিরোধীদের দল ভারী করে আছেন। তাও নয় আছেন, থাকতেন ইউরোপে। কিন্তু এই সাম্যবাদ-বিরোধীদের মধ্যে এমন লোক বড় দেখিনি—যিনি যথার্থ 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী'। যদি কেউ থেকে থাকেন তাঁকে দেখিনি। আর কে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, কে সাম্রাজ্যবাদের এ্যাপোলজিস্ট—একথা আমাদের মত দেশের লোকের বুঝতে দেরী হয় না—এরা কেউ মুখ খুললেই তা আমরা টের পাই। অনেক সময় বলতে পারি—প্রায় গন্ধেই বুঝতে পারি—প্রায় দু'শ বৎসর ধরে যে ও গন্ধটা আমাদের চেনা। তৃতীয় একটা বিষয়ও দেখেছি—'সাম্যবাদবিরোধীরা পশ্চিমা ডিমোক্র্যাসির দল, তার মানে তাঁরা পোলিটিক্যাল ডিমোক্র্যাসি

চান বটে—কিন্তু ইকনমিক ডিমোক্র্যাসির বিরুদ্ধেই তাঁদের জেহাদ। ওদেশের মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' বলতে যাদের বোঝায় তারা এজন্যই সাম্যবাদবিরোধীও। আর সে জেহাদ চালাতে গিয়ে যদি 'পোলিটিক্যাল ডিমোক্র্যাসি'কেও বরবাদ করতে হয়, নিজের দেশের স্বাধীনতাকেও খর্ব করতে হয়, তাতেও তারা পিছপা নয়। রাজনীতির গোলকধাঁধায় আমি ঘুরিনি, ঘুরেছি ইংল্যাণ্ড-ইউরোপের পথে-পথে, সাম্রাজ্যবাদপীড়িত এশিয়ার মেয়ে হিসাবে। শাদা চোখে আমারও মনে হয়েছে ওঁদের প্রশ্নটা এই—কে ইকনমিক ডিমোক্র্যাসি চাও, কে চাও না; এবং কে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চাও, কে তা চাও না।

ইউরোপ থেকে ফেরার পথে দু'একটি বেলজিয়ান আর আমেরিকান ছেলেমেয়ের সাথে আলাপ করি। তাদের পূর্ব-ইউরোপ সম্বন্ধে ধারণাটা ইংল্যাণ্ডের থেকে অন্য রকম নয়। কেউ বলে রাশিয়ার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ভালই। কিন্তু গত যুদ্ধের পর থেকেই স্তালিন একনায়করূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁর কঠোর নীতির ফলে সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য দলগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সাম্যবাদের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছে সারা পশ্চিম-ইউরোপ আর আমেরিকায়। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য চারদিকে সাজসাজ রব। এ সম্বন্ধে সবাই তারা একমত যে "nobody knows what is happening in Russia since 1918."

রাশিয়া এবং রুশশাসিত অঞ্চল থেকে ফিরে আসা যে সত্যিই ভাগ্যের কথা তার প্রমাণ পেয়েছিলাম অষ্ট্রিয়া যাবার পথে। মার্কিন সীমারেখা Linz পার হবার পর হঠাৎ তাকিয়ে দেখলাম আমার চারপাশে কেউ নেই। গাড়ীর ভিতর থেকে বা'র হয়ে বারান্দায়

এলাম—গোটা বগিখানাতে আমি একাকী যাত্রী, ইতস্ততঃ ছড়ানো দু'একটি রুশ সৈন্য ও সামনে দীর্ঘ পথ। জিজ্ঞাসা করে জানলাম আর ৬ ঘণ্টা পর ১১-৩০ মিনিটে গাড়ী পৌঁছবে ভিয়েনা। সৈন্যদের কেউ আমার ভাষা জানে না—আমি ত তাদের ভাষা জানিই না। চকিতে মনে পড়ে গেল আমাদের দেশের অবস্থা—সাহসে কুলোত কি এই রাত্রে এতখানি পথ একা সৈন্যদের সংগে এক গাড়ীতে যাওয়া? আমার পুর্বতন সহযাত্রীদের নামবার আগেকার অদ্ভুত দৃষ্টির মানে এবার বুঝতে পারলাম,—আমি সোভিয়েট এলাকায় প্রবেশ করেছি। সংশয় আর শংকায় দোল খেতে খেতে চলে এলাম ভিয়েনায়। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। স্টেশনে টাকা ভাংগিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে হোটেলের নাম বলে দিতেই জায়গামত এসে উপস্থিত হলাম।

তিন সপ্তাহ ভিয়েনায় কাটিয়ে আবার রওয়ানা হলাম। নব-পরিচিত বন্ধুরা স্টেশনে এসে তুলে দিয়ে গেল। হঠাৎ এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে বললেন,—"তুমি ভিয়েনায় কদিন ছিলে? কেমন লাগল আমাদের দেশ?" তারপর পকেট থেকে একটি ফুল বের করে বললেন,—"এর নাম Eidelwiss. অষ্ট্রিয়ার পর্বতে এর জন্ম—পৃথিবীর আর কোথাও তুমি এ পাবে না। যতদিন খুসী থাকবে—নষ্ট হবে না। এটি তুমি ভিয়েনার স্মৃতি হিসাবে তোমার কাছে রেখে দাও।" মুগ্ধচোখে তাকিয়ে রইলাম ফুলটির দিকে, ধন্যবাদ দিয়ে গ্রহণ করলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল ইংল্যাণ্ড, সেদেশে ভারতীয়ের মর্যাদা নেই। পদে পদে হোঁচট খেয়ে শিখেছি ওদের আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন। এমন কি একথাও শুনেছি, "তুমি এখন ইংল্যাণ্ডে আছ, শাড়ী ছেড়ে গাউন পরনা কেন? আমাদের দেশে আমাদের বেশভূষা পরাই ত কর্তব্য"। আর ভিয়েনাবাসীর কাছে শাড়ী পরেছি বলে নিজের ঐতিহ্য

ছাড়িনি বলেই পেয়েছি শ্রদ্ধা আর সম্মান। কয়দিন দেখাশোনার পর স্টেশনে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যায়, এ জিনিস ইংল্যাণ্ডে একেবারেই দুর্লভ।

সহযাত্রী ছিলেন দু'জন আর্জেন্টিনার বাসিন্দা, জাতিতে ইতালিয়ান, আর একজন অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক ও তার বৃদ্ধা মা। বৃদ্ধা ও তার ছেলে নেমে গেলেন মাঝপথে লেক অঞ্চলে ; ইতালীয় দু'জন রইলেন। তাঁদের সংগে আলাপ চালালাম—সব ভাষার মিশ্রণে। ওঁরা ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে ভিয়েনায় এসেছিলেন, সশংকচিত্তে সেখানে দু' সপ্তাহ কাটিয়ে এবার যাচ্ছেন ভেনিস। কিছুক্ষণ পর গাড়ীতে দুজন রুশ সৈন্য প্রবেশ করল ; তাদের কাজ পাসপোর্টের তদারক করা। যথারীতি কর্তব্য শেষ করে তারা যখন চলে গেল, ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে এল Seimmering—রুশ সীমান্ত। যথারীতি পাসপোর্ট দেখা এবং আনুষ্ঠানিক তদারকের পরে গাড়ী এল মার্কিন সীমান্তে। ভদ্রলোক দু'জন গলা কাটার ভংগীতে হাত দিয়ে ইসারা করে বোঝালেন—এবারের মত খুব বেঁচে গিয়েছি, রাশিয়ান এলাকা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি।

সুইজারল্যাণ্ডে এসে একটা হোটেলে ছিলাম দিন পাঁচেক। ভ্রাম্যমানদের দেশ বলেই বোধহয় এদেশে ভ্রমণবিলাসীদের বেশ আদরযত্ন। ইংল্যাণ্ড থেকেই হোটেল ঠিক করা ছিল, কাজেই ভাষা-বিভ্রাটে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। স্টেশন থেকে হোটেলের নাম লেখা কার্ড দেখিয়ে পোর্টার এসে নিয়ে গেল। তখনও পান্থমরশুম সুরু হয়নি। কয়েকজন সুইস ছেলেমেয়ে আর একটি জার্মান ভদ্রমহিলা, এরাই মাত্র সে হোটেলের বাসিন্দা। আর একটি ভদ্র-মহিলা এসেছেন বুলগেরিয়া থেকে। জার্মান ভদ্রমহিলা সামান্য

ইংরেজী জানেন, আর ইংলিস, সুইস্‌, ইতালিয়ান ও ফরাসীভাষা জানা একজন পরিচারিকা আছেন। তাঁদেরই সাহায্যে কোনরকমে সন্ধ্যা-বেলাটা কাটিয়ে দিতাম গল্প করে। আমার উপর ওদের ভয়ানক সহানুভূতি। কারণ, সাধারণ ভারতীয় অথবা সাধারণ ভ্রাম্যমানরা নাকি এত দুঃসাহসী এবং কৌতুহলী হয় না। তাঁরা কয়জন ভারতীয় দেখেছেন তা ত জানি না, তবে প্রশংসাটা শুনতে ভালই লাগল। রোদবৃষ্টি মাথায় করে ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়তাম একখানা ম্যাপ হাতে ক'রে। দেশ দেখতে এসেছি, ঘরে বসে থাকলে চলবে কেন? আকারে ইংগিতে ও কাগজকলমের সাহায্যে গন্তব্যস্থলের নাম, পোস্টাফিস, ট্রামস্টপ ইত্যাদি বের করতে অসুবিধা হোত না। একদিন ফিরে এলাম যখন সান্ধ্য-আহারের সময় হয়ে গিয়েছে। যথারীতি খাবার পর লাউঞ্জে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল সবাই। আমি বললাম, "তা মন্দ নয়।" হোটেলের ম্যানেজার তাঁর ফরাসী ইংরাজী আর ইতালিয়ান মিশ্রিত ভাষায় জানালেন সবাই আমার দেশ সম্বন্ধে ভীষণ কৌতূহলী। প্রথমে একজন জিজ্ঞেস করলেন—"সারাদিন কাটল কি করে?" সারাদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে করতে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলাম—"পেইন্টিংগুলো দেখতে দিল না, কারণ সময় উৎরে গিয়েছিল। তাই রাগ করে লেক আর তার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ীটার ছবি তুলে ফেলেছি ক্যামেরায়।" এঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরা নামটাই বলতে পারলেন পরিষ্কারভাবে,—ইংরাজের মত "ট্যাগোর" বলে নাক সিঁটকে জিজ্ঞেস করলেন না—"সে আবার কে?" জিজ্ঞেস করলেন গান্ধীবাদ সম্বন্ধেও। তারপর আমি যখন পাল্টা প্রশ্ন করলাম—"তুমি বুলগেরিয়ান, তাহলে এখন তুমি কোথায় আছ?" (কারণ এতদিনে আমার বেশ অভিজ্ঞতা

হয়েছে বুলগেরীয় বা হাংগেরীয় ভদ্রলোকরা সাধারণতঃ এখন স্বদেশে বাস করে না।) জবাব পেলাম, 'দেশে কি আর থাকবার উপায় আছে কম্যুনিস্টদের জ্বালায়? আমার মা বাবা রয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আমি আর যাব না। জীবন আর ধনসম্পত্তির যেখানে কোন অধিকার নেই, সেখানে বাস করা ত বিড়ম্বনামাত্র।" আমি বললাম, "তোমার তাহলে ত বড় কষ্ট। আমি একবছরেই বিদেশে হাঁফিয়ে উঠেছি। আর তোমার ত ফেরারই কোন আশা নেই।"

"দেশ কি আর আমার আছে যে কষ্ট হবে—ও ত' কম্যুনিস্টদের দেশ।"

সুইজারল্যাণ্ড থেকে একদিন গাড়ীতে চেপে বসলাম ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসব। ঈস্টারের ছুটি তখন শেষ হয়ে এসেছে—কাজেই গাড়ীতে অবসর যাপনেচ্ছুর অভাব নেই। তার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাই বেশী। ওদের উৎসাহ অদম্য। একটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট আর সামান্য একটি হাতব্যাগ এট্যাচিকেশ সম্বল করে ওরা বেরিয়ে পড়েছে একটু বৈচিত্র্যের আশায়। ইউরোপে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ প্রথম শ্রেণীর মত আরামদায়ক না হলেও মোটেই অস্বস্তিকর নয়। তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম (ইংল্যাণ্ডে কিন্তু সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণী থাকে না—থাকে কেবল প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী) সবারই দেখা হয় খাবার গাড়ীতে। গাড়ীর বগীগুলো এমনভাবে জোড়া লাগানো যাতে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত না নেমেই চলাফেরা করা যায়। খাবার গাড়ীতে পাশের টেবিলে বসেছিল একটি আমেরিকান ছাত্র আর একটি মার্কিন ছাত্রী। দুজনেই অতি আগ্রহের সংগে আমার সংগে আলাপ করতে চাইল। ওরা ভারত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চায়। সেদিন গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়, কোথায় যেন সৈন্য আমদানী

করা হচ্ছে। আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, বললাম,—"আমার গাড়ীতে এস—তোমাদের সংগে গল্প করা যাবে।"

ওরা বলে,—"তা কি করে হবে? আমাদের যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট। তার চেয়ে বরং তুমি আমাদের গাড়ীতে এস।"

আমি বললাম—"আমার ক্যামেরাটা ফেলে রেখেছি, একটু আশংকা রয়েছে।"

"আচ্ছা চল।"

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আচ্ছা, তোমাদের দেশে নাকি কালা আদমীদের উপর বড় অত্যাচার করা হয়,—জাতিবৈষম্যটা বড়ই বেশী?"

সে বললে,—"কি জান, আমাদের দেশের শাদা লোকগুলা বড়ই বোকা। ওরা বুঝছে না যে ওদের কবর ওরাই খুঁড়ছে। আমার বাড়ীতে প্রায়ই ঝগড়া হয় মা, বাবা, ভাইবোনের সংগে। ওরা যে কেন নিগ্রোদের বা ভারতীয়দের দেখতে পারে না, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।"

বললাম,—"তুমিই বা তোমার বাড়ীর থেকে আলাদা মত পোষণ কর কেন? একজন ভারতীয়ের সংগে কথা বলছ বলে মতটা বদলালো না ত হঠাৎ?"

একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল—"কি জান, পড়াশোনা করে আর যুক্তি দিয়ে বদলেছি। তাই বাড়ীর লোকের সংগে যত ঝগড়াই করি না কেন—কোনও নিগ্রো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইব না কোনদিন। কয় পুরুষের জমান বর্ণবিদ্বেষ আছে আমার রক্তে, তাই আছে হঠাৎ পাওয়া যুক্তিতে প্রচণ্ড ধার। তার ছোঁয়াচটা ভালবাসা অবধি পৌছয়নি এখনও। তবে আমার যে সন্তান হবে তাকে শিখিয়ে যাব মানুষে মানুষে সাম্যের গান।"

একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষ আমরা—অনেকেই জাত মানি না। কিন্তু তা এই ছেলেটির বর্ণবিদ্বেষ না মানারই মত—এখনো তার বেশী নয়। তবু একটি খাঁটি মার্কিন ছাত্রের কাছ থেকে এতটাও আশা করিনি। বল্লাম—

"এই যদি তোমার মত হয়, তবু বলব তোমাদের দেশে এমন লোকের সংখ্যাও খুব কম।"

"তা সত্যি, তবে নিগ্রোরা জেগে উঠেছে, তারাও আর বেশীদিন এ অত্যাচার সইবে না,—আমাদের মত ওপর-পড়া উপকারীরাও ওদের সংগে যোগ দিচ্ছে।"

"তোমার কি মনে হয় বাইরের চাপে ওদের উন্নতি হবে কিছু?"

"ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে যদি সমানভাবে চাপ পড়ে তাহলে এ বৈষম্য দূর হতে বাধ্য। তবে তোমরা ভারতীয়রাও ত কম অত্যাচার সহ্য কর না। তোমরাও ত চাপ দিতে পার, আর তোমাদের দেশের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

"যথা—"?

"তোমাদের নেহরু ত আর চিরকাল নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে থাকতে পারবেন না, তাঁকে একপক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। তিনি কোন পক্ষ নেবেন জানার জন্য আমাদের দেশের লোকেরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। তোমার কি মনে হয়?"

চিন্তিতের ভংগী করে বললাম,—"দেখ আমাদের সরকারের কথা ত বলতে পারি না, তবে নিরপেক্ষ হবে না কেন? আয়ার্ল্যাণ্ড ত দিব্যি নিরপেক্ষ ছিল গত যুদ্ধে; আর সুইডেন,—তার কেরামতিই ত সেদিকে সব থেকে বেশী।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ছেলেটি বলল,—"আরে রেখে দাও

করা হচ্ছে। আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ছিল, বললাম,—"আমার গাড়ীতে এস—তোমাদের সংগে গল্প করা যাবে।"

ওরা বলে,—"তা কি করে হবে? আমাদের যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট। তার চেয়ে বরং তুমি আমাদের গাড়ীতে এস।"

আমি বললাম—"আমার ক্যামেরাটা ফেলে রেখেছি, একটু আশংকা রয়েছে।"

"আচ্ছা চল।"

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"আচ্ছা, তোমাদের দেশে নাকি কালা আদমীদের উপর বড় অত্যাচার করা হয়,—জাতিবৈষম্যটা বড়ই বেশী?"

সে বললে,—"কি জান, আমাদের দেশের শাদা লোকগুলা বড়ই বোকা। ওরা বুঝছে না যে ওদের কবর ওরাই খুঁড়ছে। আমার বাড়ীতে প্রায়ই ঝগড়া হয় মা, বাবা, ভাইবোনের সংগে। ওরা যে কেন নিগ্রোদের বা ভারতীয়দের দেখতে পারে না, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।"

বললাম,—"তুমিই বা তোমার বাড়ীর থেকে আলাদা মত পোষণ কর কেন? একজন ভারতীয়ের সংগে কথা বলছ বলে মতটা বদলালো না ত হঠাৎ?"

একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল—"কি জান, পড়াশোনা করে আর যুক্তি দিয়ে বদলেছি। তাই বাড়ীর লোকের সংগে যত ঝগড়াই করি না কেন—কোনও নিগ্রো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইব না কোনদিন। কয় পুরুষের জমান বর্ণবিদ্বেষ আছে আমার রক্তে, তাই আছে হঠাৎ পাওয়া যুক্তিতে প্রচণ্ড ধার। তার ছোঁয়াচটা ভালবাসা অবধি পৌছয়নি এখনও। তবে আমার যে সন্তান হবে তাকে শিখিয়ে যাব মানুষে মানুষে সাম্যের গান।"

একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষ আমরা—অনেকেই জাত মানি না। কিন্তু তা এই ছেলেটির বর্ণবিদ্বেষ না মানারই মত—এখনো তার বেশী নয়। তবু একটি খাঁটি মার্কিন ছাত্রের কাছ থেকে এতটাও আশা করিনি। বল্লাম—

"এই যদি তোমার মত হয়, তবু বলব তোমাদের দেশে এমন লোকের সংখ্যাও খুব কম।"

"তা সত্যি, তবে নিগ্রোরা জেগে উঠেছে, তারাও আর বেশীদিন এ অত্যাচার সইবে না,—আমাদের মত ওপর-পড়া উপকারীরাও ওদের সংগে যোগ দিচ্ছে।"

"তোমার কি মনে হয় বাইরের চাপে ওদের উন্নতি হবে কিছু?"

"ভিতর থেকে ও বাইরে থেকে যদি সমানভাবে চাপ পড়ে তাহলে এ বৈষম্য দূর হতে বাধ্য। তবে তোমরা ভারতীয়রাও ত কম অত্যাচার সহ্য কর না। তোমরাও ত চাপ দিতে পার, আর তোমাদের দেশের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

"যথা—"?

"তোমাদের নেহরু ত আর চিরকাল নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে থাকতে পারবেন না, তাঁকে একপক্ষ অবলম্বন করতেই হবে। তিনি কোন পক্ষ নেবেন জানার জন্য আমাদের দেশের লোকেরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। তোমার কি মনে হয়?"

চিন্তিতের ভংগী করে বললাম,—"দেখ আমাদের সরকারের কথা ত বলতে পারি না, তবে নিরপেক্ষ হবে না কেন? আয়ার্ল্যাণ্ড ত দিব্যি নিরপেক্ষ ছিল গত যুদ্ধে; আর সুইডেন,—তার কেরামতিই ত সেদিকে সব থেকে বেশী।"

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ছেলেটি বলল,—"আরে রেখে দাও

তোমার আয়ার্ল্যাণ্ড আর সুইডেন। ওরা ত ভারতের ছোট এক এক টুকরোর সমান। তোমাদের বিরাট দেশকে হাতে পেলে আমরা রাশিয়াকে আর ভয় করি না।"

হেসে বললাম,—"এখন তাহলে কিছু কিছু ভয় আছে বল ?"

সেও হেসে ফেলল,—"তুমি ত আচ্ছা চালাক ?"—টিকিট চেকার এসে রসভংগ করল। ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলল, "আমি ত নেমে যাচ্ছি ফ্রান্স এ। যদি কোনদিন নিউইয়র্কএ আস তোমার সংগে দেখা হলে সুখী হব।"

ঠিকানাটি লিখে দিয়ে সে চলে গেল তার গাড়ীতে। কিন্তু তার কথাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

ফরাসী সীমান্তে গাড়ী এলে পর অভাব পড়ল কিছু মুদ্রার। তাই সীমান্ত স্টেশনে গাড়ী থামার পর লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম টাকা ভাংগাবার অপেক্ষায়। পিছনেই দাঁড়িয়েছিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, বললেন,—"দাও তোমার টাকাটা ভাংগিয়ে দি।" বললাম,—"ধন্যবাদ, কিন্তু প্রয়োজন নেই।" ভদ্রলোক একটু অবাক্ হলেন মনে হোল—কিন্তু কেন জানি না ভদ্রলোকের চেহারাটা কিছুতেই আমার ঠিক ভাল লাগছিল না।

বললাম,—"কিছু মনে কোর না, কিন্তু আমরা পুবদেশের মেয়েরা, অপরিচিতের কাছ হতে সাহায্য বড় একটা নিই না।"

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন—"এ ত প্রশংসার কথা। কিন্তু কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ? এই এসেছ দেশ থেকে ?"

"না। গিয়েছিলাম অনেক জায়গায়। এবার ফিরছি ইংল্যাণ্ড, কিছুদিন পর দেশে ফেরার ইচ্ছা।"

ভদ্রলোক বললেন,—"আমার বাড়ী নিউজীল্যাণ্ড। ঘুরেছি আমি অনেক জায়গায়। সারা পৃথিবী কয়েকবারই চক্কর দিয়েছি কাজ উপলক্ষে। বড় ভাল লাগে আমার দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়াতে। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে সংগে যায়, কখনও বা দেশে থাকে।"

বাধা দিয়ে বললাম,—"রাশিয়ায় গিয়েছ?"

বলল,—"হ্যাঁ, দুবার।"

"লৌহ-যবনিকা কি করে পেরলে?"

"আমরা ব্যবসায়ী, আমাদের সব কাজই ত করতে হয়। তবে ও দেশটা আমি তেমন পছন্দ করি না।"

"তাই নাকি?"

অসমাপ্ত কথার মাঝে কাজ শেষ হয়ে গেল; তাড়াতাড়ি গাড়ীতে ফিরে এলাম। আমরা ইংরেজ নই, পথেঘাটে গল্প করতে ভালোই বাসি। কিন্তু গায়ে পড়ে যে কথা বলে তাকে তবু পছন্দ করতে পারি না।

গাড়ী এসে ক্যালে বন্দরে থাম্‌ল। জাহাজে উঠে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছি। পেছন থেকে কে যেন বলে উঠ্‌ল,—"হ্যালো, তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে বিশ্বসংসার খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

বিস্ময়ের সুরে বললাম,—"কেন বলত? টাকা বদল হয়ে গিয়েছে বুঝি?"

"আরে না, না। তোমার সংগে আলাপ করব বলে।"

"সৌভাগ্য আমার!"

"সৌভাগ্য ত তোমার নয়, সেকথা বোলো না। তোমার মত বেপরোয়া মেয়ের সংগে আলাপ করতে চাই। কারণ আমরা শুনেছি ভারতীয় মেয়েরা অত্যন্ত পর্দানসীন আর কুনো স্বভাবের।"

"প্রমাণ ত চোখের সামনেই রয়েছে। তবে তোমার কথায় প্রমাণ হল, শুধু দেশই বেড়িয়েছ, দেশটা দেখনি। ভারতীয় সমাজের সে কূপমণ্ডুকতা অনেককাল কেটে গিয়েছে। বিদেশীর আক্রমণে যে রক্ষণশীলতা একদিন দেখা দিয়েছিল সমাজে, ধীরে ধীরে তার থেকে উদ্ধার পাবার প্রচেষ্টাও দেখা দিয়েছে। তাই আমরা বেরিয়েছি দেশে-বিদেশে জ্ঞান-প্রসার আর বিদেশের সমাজের ভালটুকু আমাদের সমাজে আহরণ করার জন্য। সময়ের গতিকে রুখতে কেউ পারে না। আজ যখন আমাদের নূতন দেশ গঠন করার সময়, তখন কি আর পর্দা ঢেকে কোণে বসে থাকলে সমাজের ভাবী যাত্রীরা মানুষ হবে?"

প্রায় একটু বক্তৃতাই করে ফেললাম। তখনকার মত কিন্তু মনে হোল—ঠিকই বলছি।

ইংলিশ চ্যানেলের ফুলে-ওঠা জলের দিকে চেয়ে নিউজীল্যাণ্ডবাসী বললে,—"কিন্তু তুমি অমন একলা বেড়াচ্ছ—তোমার বন্ধুবান্ধব কেউ নেই?"

বললাম,—"দেশে আছে স্বামী পুত্র ভাইবোন; আর এদেশেও পথিকবন্ধুর অভাব নেই। এরা মেয়েদের যে সম্মান আর স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তার ফল ত আমরাও সমানেই ভোগ করি। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ট্রেন, ষ্টীমার সর্বত্রই লোকের ভীড়। কিন্তু একলা মেয়ে যাচ্ছে বলে ওরাও আড়চোখে তাকিয়ে দেখে না।" বলে আমিই আড়-চোখে তাকালাম মুখের ভাবটা দেখার জন্য।

প্রসংগের মোড় ঘুরাবার জন্য দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সে বলল,—"আমি কিন্তু এই আসছি অস্ট্রেলিয়া থেকে কলম্বো-বোম্বাই হয়ে—এবার ফিরে যাব নিউজীল্যাণ্ড।"

"তাই নাকি? তাহলে এবার তুষারপাতের সময় তুমি কোথায় ছিলে?"

"সে এক মজা! ছিলাম লোহিতসাগরে। যে লোহিতসাগর তার উষ্ণতার জন্য অমন নাম কিনেছে—সেখানেও এবার আমরা কম্বল গায়ে দিয়েছি।"

বললাম,—"এবারের তুষারস্রোত কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে উত্তর রাশিয়া থেকে এসেছে।"

"তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ। আমরা তামাসা করে বলি—স্ট্যালিন পশ্চিম ইউরোপকে জব্দ করতে তুষারতরংগ পাঠিয়েছে।"

"ও নাম আমার কাছে কোরোনা। ঐ ব্যক্তিটির নাম আমি শুনতে পারি না।"

বিস্মিতের ভান করে বললাম,—"ভদ্রলোক এত ভাল-ভাল কাজ করেছে—দেশটাকে উন্নত করেছে, আর তুমি তার উপর এত চটা?"

ব্যংগের স্বরে সে বলল,—"উন্নত, না আরও কিছু। সারা দেশটাকে ক্রীতদাসে ভর্তি করে ফেলল। লোকগুলোকে খেতে অবধি দেয় না পেট ভরে। একেবারে মেসিন বানিয়ে ফেলেছে। অত্যাচারে অত্যাচারে দেশটাকে একেবারে হিটলারের জার্মানী বানিয়ে ফেলেছে। হিটলারের জার্মানীকে লোকে বিশ্বাস করত, এদের তাও করে না।"

"বল কি? দেশের লোকগুলো আপত্তি করে না?"

"আরে, আপত্তি করবার যো আছে নাকি? তাহলে একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না?"

"তুমি যে একেবারে ভয় ধরিয়ে দিলে। আমার যে একবার ওদেশটা দেখার ইচ্ছে ছিল।"

ভদ্রলোক অদ্ভুতদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "দাঁড়াও, আমি আমার স্ত্রীকে একবার দেখে আসি।"

সেই যে ভদ্রলোক পিছন ফিরলেন আর তাঁর দেখা পেলাম না। পাব না জানতাম বলেই ও প্রসংগের অবতারণা—রাশিয়ার নাম একেবারে দাওয়াইএর মত কাজ করে পশ্চিম ইউরোপবাসীর হাত থেকে বাঁচার পক্ষে।

জাহাজ থেকে নামার সময় হয়ে এল। সংগের স্যুটকেসটা যাবার সময় বেশী ভারী ছিল না। আসবার বেলা দেখলাম নানাদেশের স্মারকচিহ্নের ওজন বেশ। পাশেই ছুটোছুটি করছিল জাহাজের এক পোর্টার। বললাম—"আমার বাক্সটা একটু উপরে তুলে দিতে সাহায্য করবে?"

"নিশ্চয়ই। আমার কাজই ত তাই। তুমি পাসপোর্ট আর ল্যাণ্ডিং কার্ড ঠিক করে রাখ—জাহাজ লাগলেই ওগুলো দেখাতে হবে।"

লাইন করে দাঁড়ালাম। পাশাপাশি দুটো লাইন। মানে বুঝতে একটু সময় লাগল। পাসপোর্ট দেখাতে দ্বাররক্ষী বলল,—"তোমার ত ও লাইন নয়, এ লাইন।" তাকিয়ে দেখলাম—আমি দাঁড়িয়ে আছি যে পাশ দিয়ে বিদেশীদের যাবার রাস্তা তার দিকে। দ্বাররক্ষী নির্দেশ দিচ্ছে—'ব্রিটিশ' মার্কা রাস্তা দিয়ে যেতে। চমকে সরে ভুল শুধরে নিলাম। ভারতীয় নাগরিকের পাসপোর্ট হাতে চেপে ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের পূর্ব পরিচিতির কৌলীন্য। কিন্তু আমাদের বন্ধুরা তা ভোলে না। কারণটা অবশ্য খুবই স্পষ্ট—আমাদের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে সত্যিই ওদের আপত্তি হতে পারে।

অবাঞ্ছিত তিক্ততার রেশ নিয়ে লণ্ডনগামী ট্রেনে চেপে বসলাম।

সামনের সীটটিতে বসেছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা, উন্নাসিকতায় আমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চেয়ে রইলেন জানালার দিকে। নীরবতা অসহ্য হয়ে ওঠায় নিজের সংগেই বিচার সুরু করলাম ঐ ভদ্রমহিলাকে নিয়ে। ইনি তাদেরই সগোত্র, যারা কিংবা যাদের আত্মীয়স্বজন উপনিবেশে গিয়ে অর্থোপার্জন করেছে—আর তারই ফলে এঁর রক্তে জমেছে বর্ণবিদ্বেষের কৌলীন্য। অথচ সমাজে পাননি কল্কে, ফলে আজও ভ্রমণ করতে হয় দ্বিতীয় শ্রেণীতে। প্রবাসীদের কাছেই প্রকাশ করা চলে কৃত্রিমতার ঝাঁঝ, সগোত্রের কাছে নিজেরও জায়গা হয় না। পথে প্রবাসে যত ইংরেজ বা ইউরোপীয় দেখেছি তারা সবাই মিষ্টভাষী সদালাপী আর সহানুভূতিসম্পন্ন। ইংলিশ চ্যানেলের এপারে যে প্রবাসী আবহাওয়া আছে, ওপারে তা নেই। 'দেশভ্রমণে উদারতা বাড়ে' এ সত্যটা উপলব্ধি করা যায় 'চ্যানেলের' জাহাজে উঠলে।

কারণটা এও হতে পারে—জাহাজে যে-কোনো ইংরেজ আমারই মত নির্বান্ধব; বিশেষ করে তারও আছে ভাষা-সমস্যা। আমরা যত সহজে ইংরেজী বলি, একজন ইংরেজ অত সহজে ফরাসী বা জার্মান বলে না। স্কুলে আমরা ইংরেজী পড়ি, ওরাও বাধ্যতামূলক-ভাবে ফরাসী কিংবা জার্মান ভাষা শিক্ষা করে। প্রত্যেক ইংরেজ ছাত্রছাত্রীকে কোন একটি বিদেশী ভাষা শিখতেই হয়—কারণ ৪০ মাইল ওপারেই ওদের ভাষা একেবারে অচল। সেখানে আমরাই ওদের কথা বলবার লোক। তাই বোধহয় আমাদের সংগে ওদের তফাৎটা কন্টিনেন্টে গিয়ে ইংরেজ অনেক পরিমাণে ভুলে যায়।

ইংল্যাণ্ডের আর্দ্র আবহাওয়া কিন্তু ইংরেজের ব্যবহারে মোটেই ছাপ

ফেলেনি, সেখানে একেবারে সাহারার রুক্ষতা। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই অতি ভদ্র জাত সাধারণ ইংরেজ। আচারে ব্যবহারে, পথেঘাটে যাদের দেখেছি তারা স্বদেশবাসীর সংগে যে ব্যবহার করে আমাদের সংগেও ঠিক সে ব্যবহারই করে। ভিয়েনা-জাত বর্তমানে ব্রিটিশ জাতিত্বের-ধারক এক ভদ্রলোককে বলেছিলাম,—"ইংরেজদের এই ছাড়-ছাড় ভাবটা আমার কিন্তু কেমন মনে হয়।" ভদ্রলোক জবাব দিয়েছিলেন,—"আমার কিন্তু ঐ জন্যেই এদের বিশেষ করে ভাল লাগে।" বোঝা গেল ভদ্রলোক ব্রিটিশ ব'নে গিয়েছেন দেহে ও মনে। অনাবশ্যক প্রশ্ন করা, অবান্তর কৌতূহল—সবই এদের রীতি-বিরুদ্ধ। তা জানতাম, তা পছন্দ না করলেও তাতে ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই। কিন্তু চোখ-কাণ খোলা রাখলে এরই মধ্যে বর্ণবিদ্বেষটা বেশ চোখে পড়ে ব্রিটেনে এখানে সেখানে। অনেককাল ধরে সাম্রাজ্য ভোগ করে এদের ভদ্রতা জ্ঞানটা অনেকটা মিশে গিয়েছে উন্নাসিকতার সংগে।

অনেক বিষয়ে এরা এগুতেও ভুলে গিয়েছে। বাস বা টিউব রেলে বা কোথাও নরনারীর বৈষম্য নেই। লেডিস্ সীটের বালাই নেই বলে কোথাও নেই অশোভন মন্তব্য আর অহেতুক উষ্মা। ইউরোপের সমাজ নারীকে কেবলমাত্র নারী বলেই বোধহয় ভাবে না—একমাত্র মাইনে দেবার সময় ছাড়া। অফিসে, ইস্কুলে, কলেজে অথবা যেকোন চাকরীতে ছেলেদের থেকে মেয়েদের মাইনে ইংল্যাণ্ডে কম। তার পক্ষে আছে অকাট্য যুক্তি। ছেলেদের পরিবার প্রতিপালন করতে হয়, মেয়েদের হয় না।

এ নিয়ে একদিন কথা হচ্ছিল এক ইউরোপীয় ভদ্রমহিলার সংগে। বাড়ী তার ছিল কোনদিন হিমকিরিটিনী সমুদ্রমেখলা ফিনল্যাণ্ডের সমৃদ্ধ এক পল্লীতে। বর্তমানে লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। স্বাভাবিক

বুদ্ধি সাধারণ ছেলেমেয়ের থেকে অনেকটাই বেশী, আর পড়াশোনাও আছে প্রচুর; মতবাদেও একেবারে রক্ষণশীল নয়। তাই তার কাছে যখন কথাটা তুললাম আশা করেছিলাম অনুকূল জবাবই পাব। আমার চিন্তাধারাকে সবেগে নাড়া দিয়ে সে বলল,—"কি যে বল তোমরা! মেয়েরা কখনও পারে পুরুষের সংগে সমানে পাল্লা দিতে? তারা সমান মাইনে চাইবে কি বলে?"

জিজ্ঞেস করলাম,—"সমান কাজ করে অসমান মাইনে নাও, তোমাদের অধিকারবোধে বাধে না? তোমার মনে হয় না কেবলমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মানোর ফলে তোমাদের বঞ্চিত করছে পুরুষ সমাজ? আর পাল্লা দিতে পারা না পারার প্রশ্ন ত এখানে উঠছে না। মাস্টারী ছেলেদের থেকে মেয়েরা ভাল পারে, এটা ত সর্বজনস্বীকৃত। নইলে প্রত্যেক সভ্যদেশে ছেলেমেয়েদের আদি-শিক্ষার ভার মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিত না। তারপর দৈনিক দশঘণ্টা হিসাবে তোমরা যে অফিসে খাট, কাজ না করলে তোমার মনিব তোমায় অমনি মাইনে দেয়? তোমার পাশে তোমার যে সহকর্মী কাজ করে সেও ত দশঘণ্টা খাটে; তাহলে তার মজুরী তোমার থেকে বেশী কেন? দু'জনের শারীরিক আর মানসিক শক্তি ত সমানই ব্যয় হচ্ছে।"

এবার সে বলল,—"ছেলেদের পরিবার প্রতিপালন করতে হয়, মেয়েদের হয় না।"

"জন্মেছিলে ভাগ্যবানের ঘরে; তখন দেখনি, কিন্তু এখন? এখনও কি বলবে তোমার খরচা একটি ছেলের থেকে কম? বিয়ে করনি, বাপ মা নেই, ফ্ল্যাট চালিয়ে থাক, অফিসে খাটছ; তোমার সমাজের ছেলের থেকে তোমার খরচাটা কম কিসে?"

"কিন্তু আমার বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হওয়াটা আমি

পছন্দ করি না বলেই অমন একলা থাকি। না হলে একলা কারো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকাটা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। তখন তাকে কিছু খরচা ধরে দিলেই ত চুকে যায় ল্যাঠা।"

"সে ত তোমার সমাজের ছেলেরাও করে থাকে। বরং তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে তোমার থেকে কম খরচ হয়। পোষাকের তফাৎটা যদিও এদেশে দামের তফাৎ খুব বেশী ঘটায় না—সে হিসাবে তোমার মাইনে ত বরং বেশী হওয়া উচিত।"

"বিয়ে করলে আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে আমার স্বামী।"

"তা না হয় নিল। কিন্তু তোমরাই ত বলে থাক আজকাল একজনের আয়ে সংসার চলে না; দু'জনে কাজ করতে হয়। বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে চাকরী করতে হলে যে পরিমাণ পরিশ্রম আর ত্যাগস্বীকার করতে হয় তার মূল্য কি কাটা পড়ে না ঐ কম মাইনের ফলে? আর ভালভাবে থাকবার, ভাল খাওয়ার জন্যই ত চাকরী করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। একটি ধনী পরিবারের ছেলেকে কি প্রচুর অর্থ আছে বলে কম মাইনে দেওয়া হয়? আর তোমাদের সমাজে বিধবা বা বিযুক্তা মেয়ের ত অভাব নেই। তাদের পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব কি তোমাদের সরকার নেয়? সন্তান হবার ফলে সন্তানের নার্শারীস্কুলযোগ্য বয়স না হওয়া পর্যন্ত যখন মাকে বাড়ীতে থেকে তার তত্ত্বাবধান করতে হয়—তখন কি তোমাদের সরকার মাকে তার ভাতা দেয়? না, মায়ের চাকরীর মনিব বছরের পর বছর তার মাইনে যুগিয়ে যায়? সবচেয়ে বড় কথা:—গলগ্রহ হয়ে আত্মসম্মান খর্ব করার চেয়ে যে মেয়ে চাকরী করা পছন্দ করে, তার পক্ষে হাত পেতে কম মাইনে নেওয়াতেই সেই আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায় কি?"

এরপর সে একটি গল্প বলল—সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি। গত যুদ্ধের সময় জাহাজে পরিবেষনকারীর অভাব হওয়ায় একটি মেয়েকে নিয়োগ করা হয়। একদিন খাবার টেবিলে পরিবেষনের দেরী হওয়ায় ক্যাপ্টেন খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন যে, পরিবেষণকারিণী একটি আস্ত ভেড়ার রোস্ট অতিকষ্টে বয়ে নিয়ে আসছে। পাত্রটির ভার ঐ মেয়েটির পক্ষে অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তার গতি হয়েছে মন্থর আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে হাঁফাচ্ছে। ক্যাপ্টেন পাত্রটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে টেবিলে রাখলেন; আর সে বেচারাও অপরাধীর মত তাকে অনুসরণ করল। ক্যাপ্টেন তখন তাকে বললেন,—"যদি পুরুষের সংগে সমান মাইনেই নেবে তাহলে সমান ভার বইতে পার না কেন?" বেচারা জবাব দিতে পারল না—সত্যিই ত জবাব দেবার ছিলই বা কি?

গল্পটি শুনে হাসব কি কাঁদব, ঠিক বুঝতে না পেরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বান্ধবী বুঝল—এবার আমাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। তাকাল আমার দিকে,—ভাবখানা "কেমন জব্দ?"

বললাম,—"সত্যিই ত সে বেচারার বিধাতা তাকে পাঠিয়েছিলেন নির্জন গৃহকোণে বসে সন্তান প্রসব করার জন্য। তাকে বিধাতা বলে দেননি যে তার স্বামী মারা যাবে রাজার হয়ে যুদ্ধ করে, ছেলে-মেয়ে প্রতিপালন করার জন্য তাকে নিতে হবে জাহাজে চাকরী, আর বইতে হবে জলজ্যান্ত সন্তানের বদলে আধপোড়া ভেড়া। ভেবে পাচ্ছি না দোষটা কার, বিধাতার, না ক্যাপ্টেনের, না ঐ হতভাগিনীর। সে যা হোক্, তুমি কখনও তোমার কোন সহকর্মীকে কোন কাজে সাহায্য করেছ?"

পছন্দ করি না বলেই অমন একলা থাকি। না হলে একলা কারো পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকাটা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। তখন তাকে কিছু খরচা ধরে দিলেই ত চুকে যায় ল্যাঠা।"

"সে ত তোমার সমাজের ছেলেরাও করে থাকে। বরং তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে তোমার থেকে কম খরচ হয়। পোষাকের তফাৎটা যদিও এদেশে দামের তফাৎ খুব বেশী ঘটায় না—সে হিসাবে তোমার মাইনে ত বরং বেশী হওয়া উচিত।"

"বিয়ে করলে আমার প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে আমার স্বামী।"

"তা না হয় নিল। কিন্তু তোমরাই ত বলে থাক আজকাল একজনের আয়ে সংসার চলে না; দু'জনে কাজ করতে হয়। বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে চাকুরী করতে হলে যে পরিমাণ পরিশ্রম আর ত্যাগস্বীকার করতে হয় তার মূল্য কি কাটা পড়ে না ঐ কম মাইনের ফলে? আর ভালভাবে থাকবার, ভাল খাওয়ার জন্যই ত চাকুরী করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। একটি ধনী পরিবারের ছেলেকে কি প্রচুর অর্থ আছে বলে কম মাইনে দেওয়া হয়? আর তোমাদের সমাজে বিধবা বা বিযুক্তা মেয়ের ত অভাব নেই। তাদের পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব কি তোমাদের সরকার নেয়? সন্তান হবার ফলে সন্তানের নার্শারীস্কুলযোগ্য বয়স না হওয়া পর্যন্ত যখন মাকে বাড়ীতে থেকে তার তত্ত্বাবধান করতে হয়—তখন কি তোমাদের সরকার মাকে তার ভাতা দেয়? না, মায়ের চাকুরীর মনিব বছরের পর বছর তার মাইনে যুগিয়ে যায়? সবচেয়ে বড় কথা:—গলগ্রহ হয়ে আত্মসম্মান খর্ব করার চেয়ে যে মেয়ে চাকুরী করা পছন্দ করে, তার পক্ষে হাত পেতে কম মাইনে নেওয়াতেই সেই আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায় কি?"

এরপর সে একটি গল্প বলল—সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি। গত যুদ্ধের সময় জাহাজে পরিবেষনকারীর অভাব হওয়ায় একটি মেয়েকে নিয়োগ করা হয়। একদিন খাবার টেবিলে পরিবেষনের দেরী হওয়ায় ক্যাপ্টেন খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন যে, পরিবেষণকারিণী একটি আস্ত ভেড়ার রোস্ট অতিকষ্টে বয়ে নিয়ে আসছে। পাত্রটির ভার ঐ মেয়েটির পক্ষে অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তার গতি হয়েছে মন্থর আর অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে হাঁফাচ্ছে। ক্যাপ্টেন পাত্রটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে টেবিলে রাখলেন; আর সে বেচারাও অপরাধীর মত তাকে অনুসরণ করল। ক্যাপ্টেন তখন তাকে বললেন,—"যদি পুরুষের সংগে সমান মাইনেই নেবে তাহলে সমান ভার বইতে পার না কেন?" বেচারা জবাব দিতে পারল না—সত্যিই ত জবাব দেবার ছিলই বা কি?

গল্পটি শুনে হাসব কি কাঁদব, ঠিক বুঝতে না পেরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বান্ধবী বুঝল—এবার আমাকে কোণঠাসা করা হয়েছে। তাকাল আমার দিকে,—ভাবখানা "কেমন জব্দ?"

বললাম,—"সত্যিই ত সে বেচারার বিধাতা তাকে পাঠিয়েছিলেন নির্জন গৃহকোণে বসে সন্তান প্রসব করার জন্য। তাকে বিধাতা বলে দেননি যে তার স্বামী মারা যাবে রাজার হয়ে যুদ্ধ করে, ছেলে-মেয়ে প্রতিপালন করার জন্য তাকে নিতে হবে জাহাজে চাকুরী, আর বইতে হবে জলজ্যান্ত সন্তানের বদলে আধপোড়া ভেড়া। ভেবে পাচ্ছি না দোষটা কার, বিধাতার, না ক্যাপ্টেনের, না ঐ হতভাগিনীর। সে যা হোক্, তুমি কখনও তোমার কোন সহকর্মীকে কোন কাজে সাহায্য করেছ?"

"নিশ্চয়ই। আমরা প্রত্যেকেই দরকার পড়লে একে অন্যের সাহায্য নিয়ে থাকি।"

"আচ্ছা সাহায্য করে বলেছ কি যে, 'এ কাজটা করতে পার না ত মাইনে নাও কেন ?'

"কি যে বল। সবাই সব সময়ে সব কাজ পারবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে ? সেজন্যই ত মানুষ সমাজে বাস করে। প্রতিবেশীর কাছ থেকে সাহায্য পায় ও করে।"

"তাহলে এবার বল দেখি ক্যাপ্টেন ঐ মেয়েটিকে সাহায্য করে কিছু অন্যায় করেছিলেন—না, তাকে ঐ বিশ্রী তিরস্কার করে মহত্ব দেখিয়েছিলেন ? ঐ শারীরিক দুর্বলতার দোহাই কি মেয়েদের মাইনে পাওয়ার বিপক্ষে দোহাই, না, কুযুক্তি পুরুষের আত্মপক্ষ সমর্থনের ?"

সেদিনকার মত মাইনের তর্ক আমরা সেখানেই শেষ করলাম। আমার ঐ বান্ধবীর বাড়ীটি ছিল প্রমীলারাজ্য। সেখানকার বাসিন্দারা সবাই খেটেখাওয়া শ্রেণীর। মাঝে মাঝে সেখানে আরও শ্রমজীবী নারীর আবির্ভাব হ'ত। তাদের সবাই (অন্ততঃ প্রায় সবাই) প্রাক্ যুদ্ধযুগে ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। বর্তমানে অতীতের রোমন্থন আর অতীতেরই শেখা কোন-একটা বিদ্যার বিনিময়ে সামান্য কিছু রোজগার করাই একমাত্র উপজীবিকা। ফলে, সাধারণ সমাজে যা হয়ে থাকে,—ব্রাহ্মণের ছেলে জুতার কারখানায় কাজ করতে করতে ভাবে,—"করছি না হয় মুচির কাজ। আমার পাশে ঐ যে জাত মুচিটি কাজ করে যাচ্ছে, আমি তার থেকে কিন্তু অনেক বড়"—এই এদের মনোভাব। এই সংকীর্ণ দৃষ্টির গণ্ডী কাটিয়ে উঠতে পারেনি ইউরোপীয় সমাজ। তাই পথেঘাটে এসব অতি-সাবধানীর দল স্পর্শদোষ এড়িয়ে চলে সযত্নে। পরস্পরের সংগে কথা বলে অতি কম, কি জানি যদি

গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে যায়। ওদের মেয়ে স্বাধীনতাও সেই পলিটিক্যাল ক্ষেত্রে, ভোট দাও, ঘোরো ফেরো—এই পর্যন্ত। কিন্তু অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সাম্যের দাবী কোরো না। মেয়েরাও তা যেন মেনে নিতেই অভ্যস্ত, তার বেশী চিন্তা করতে আর চায় না।

ইউরোপ থেকে ফিরে যখন কলেজে প্রবেশ করলাম বান্ধবী এবং অধ্যাপিকারা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন আমার অভিজ্ঞতার কথা। তাঁদের প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল,—"কেমন দেখলে ইউরোপ?"—অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ভাল নয় নিশ্চয়ই। জবাব দিলাম,—"ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নই ওঠে না। তবে মনে হচ্ছে আবার ইংল্যাণ্ডে না ফিরে এলেই হোত,—এই আলোচনার হাত এড়ানো যেত।"

"ঐ ত হয়। যে এখান থেকে ইউরোপে যায় সে আর ইংল্যাণ্ডের ভদ্র আবহাওয়াকে সহ্য করতে পারে না। অথচ শুনেছি ওদেশে লোকেরা চুরি করে, ঠকায় বিদেশীকে, অনাবশ্যক কৌতূহল দেখিয়ে লোককে বিব্রত করে।"

"খবরগুলো যে-ই তোমায় দিক, একেবারে মিথ্যা নয়, তবে সত্যের খুব কাছ দিয়ে যায় নি। আর খানিকটা কৌতূহল দেখায় বলেই না আমাদের অত ভাল লাগে। আসল কথা কি জান? ওসব দেশে যত তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রসারিত করেছিলাম, এদেশে তত তাড়াতাড়ি নিজেকে গুটিয়ে আনতে পারছি না। এখনো মনে পড়ছে তোমাদেরই দেশের মেয়ে মণিকা ফেন্টনের কথা। তাকেও দেখলাম সেখানে।"

"সে আবার কে?—আমাদের কথাত তুমি একবারও মনে কর না। কিন্তু পথ চলতে কার সংগে দেখা হয়েছে তার কথা এখনও ভুলতে পারছ না?"

"ভুলব কি করে? যে তেজ আর দীপ্তি দেখেছিলাম তাঁর চোখেমুখে, কোরিয়ার বোমাবিধ্বস্ত দেশের যে বর্ণনা তাঁর কাছ থেকে শুনেছি, তা কি ভোলবার?"

"তুমি ঐসব নাপাম বোমার কথা বিশ্বাস কর বুঝি?"

"না করে উপায় নেই বলেই করি। কে ভাবতে পারত মানুষ মানুষকে এভাবে হত্যা করে আনন্দ পায়? নারীশিশু নির্বিশেষে অত্যাচারের বলি হয়? আচ্ছা মিসেস্ পার্কার, তোমার কি মনে হয় এই সম্বন্ধে? তুমি কি মিসেস্ ফেল্টনের বক্তব্য পড়েছ?"

"যদি সত্যিই এরূপই ঘটে থাকে কোরিয়ায়, তা'হলে তা ভয়াবহ। তবে কি জান, মনে হচ্ছে মিসেস্ ফেল্টন অনাবশ্যক উত্তেজিত হয়েছেন।"

"আর সেজন্যেই তাঁর উত্তেজনা-প্রশমনের ব্যবস্থা হয়েছে তাঁর পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করে?"

"তা নয়। তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে বিনাছুটিতে হঠাৎ তদন্ত কমিশনের ভার নিয়ে কোরিয়ায় চলে যান—এটা আইনতঃ অপরাধ। এর পর তাঁকে আর ঐ পদে রাখা চলে না।"

"আমরা কিন্তু বাইরে থেকে ভাবতে পারি, কোরিয়ায় যাওয়া এবং আমেরিকান নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ।"

এবার অধ্যাপিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল—"তোমরা খালি পরের মুখে ঝাল খাও। ইংল্যাণ্ডের সব কাগজেই বেশ পরিষ্কার করে এ কথাটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেগুলো দেখলেই জানতে পারবে।"

ইংল্যাণ্ডের 'সব কাগজই' অবশ্য কোটি কোটি টাকার মালিকদের তাঁবে; তারা যা বলায় তা বলে, তারা যা শোনায় কাজেই ইংল্যাণ্ডের

লোকেও তা'ই শোনে। Fredom of opinion-এ তাই ওই স্বাধীন ইংল্যাণ্ডের কোটিপতিদেরই একটানা মালিকানা।

জিজ্ঞাসা করলাম,—"আচ্ছা কোরিয়ার ব্যাপারে আবার কি একটা বিশ্বযুদ্ধ লাগবে, তোমার কি মনে হয় ?"

"যদি লাগে তাহলে পৃথিবীতে সভ্যতা, কৃষ্টি বলে আর কিছু থাকবে না। সমাজ যাবে ধ্বংস হয়ে।"

এ বোধটা মনে হয় ইংল্যাণ্ডের অনেক মানুষেরই হয়েছে।

পাশ থেকে বাধা দিল নিউইংল্যাণ্ড প্রবাসী একটি ইংরেজ মেয়ে—"রাশিয়ার কেন্দ্রস্থলে যদি একটি আনবিক বোমা ফেলে দেওয়া যায়—তাহলে আর কোন চিন্তা থাকে না।"

এ ভরসাও যে তাদের না আছে তা নয়—আনবিক বোমা অন্যের মাথাতেই পড়বে, তাদের নয়। তাই মনে করিয়ে দিলাম,—"কিন্তু তার পরমুহূর্তেই যদি পিকিং থেকে একটি হাইড্রোজেন বোমা ফেলে নিউইয়র্ক বা লণ্ডন শহরে, তাহলে তোমার মনের মত সমাধান ত হয় না।"

মেয়েটি চটল,—"যত নষ্টের গোড়া তোমরাই। চীন লৌহযবনিকার আড়ালে যেতেই তোমরা লাফাতে আরম্ভ করলে। এবার মজাটা বোঝ। তিব্বতও চলে গেছে। এর পর কোনদিন শুনব ভারতবর্ষের আরও বেশ খানিকটা অংশ কম্যুনিস্টরা কেড়ে নিয়ে তোমার গলায় গামছা দিয়ে লাল রাশিয়ান ছেলের সংগে তোমাকে থাকতে বাধ্য করেছে।"

"তেমন দিন যদি আসেই না হয় ভারতীয় মেয়ে জহরব্রত করে সম্মান বাঁচাবে, না হয় তোমাদের American occupied ইউরোপের মেয়েরা যেমন থাকে তেমনি সুখে থাকবে। কিন্তু তার আগে

এটাও ত দেখতে হবে যে—ভারতে আর দুর্ভিক্ষ হবেনা; নতুন চীনের মত তার দেশের লোকেরা নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় আবার ঝলমল করে উঠবে। যেমনি করে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত চীন আজ মাত্র তিন বছরে ভারতকে সাহায্য করছে ৫লক্ষ টন চাল দিয়ে তেমনি সাহায্য আমরা হয়ত তোমাদেরই করতে পারব; আর কাজ পাব, কাজ করব, শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে আমার দেশে।"

এবার শাসনের পালা:—"তোমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও বুদ্ধিতে শিশু আছ। এটা বোঝার তোমার সাধ্য নেই যে, চীনকে সামনে শিখণ্ডী খাড়া করে তোমাদের চা'ল জোগাচ্ছে রাশিয়া—তার বদান্যতা দেখিয়ে তোমাদের গ্রাস করার জন্যে।"

"তোমাদের হাতে দুশ বছর ধরে থেকেও যখন খাওয়াপরা কিছুই লাভ হল না তখন অগত্যা খাবার লোভেও ত ওদের হাতে যেতে হবে" —বললাম হাসতে হাসতে।

নিতান্ত কৃপাদৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি।—"নাঃ এ আর খাওয়া ছাড়া কিছু বোঝে না।"

বললে হয়ত আমার ইংল্যাণ্ডের সহপাঠিনী ও সহকর্মিণীরা বিশ্বাস করতেন না—ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজ জাতকেও আমরা আসলে কম ভালবাসি নি। তবে এই ভালবাসার মধ্যে আছে বাধা--তাদের ও আমাদের গত দু'শ বছরের সম্পর্ক। তারা এখনো ভুলতে পারেনা— আমরা ছিলাম তাদের সাম্রাজ্যের খাস প্রজা। (চটে উঠলে এরা বলে—"They do not pay homage to our Queen" যার চেয়ে বড় গাল ওদেশে আর নেই) আমরাও ভুলতে পারিনা—এরা ছিল আমাদের শাসক শত্রু, আর এখনও থাকতে চায় মুরুব্বি, মুনিব। সম্পর্কটা এখনও সমানে-সমানে ব'লে কোনো পক্ষই মনে মনে মানিনা।

সত্যি সমানে-সমানে যখন হবে, তখনো হয়ত অতীতের স্মৃতি কালো-ছায়া ফেলবে কিছুদিন। অবশ্য তারপর যদি ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ বোঝে যে আসলে 'সাম্রাজ্যটা' তাদের ছিলনা—ছিল তাদের শাসকদের—আর সেই শাসকরাই ছিল আমাদের শত্রু; সাধারণ ইংরেজ তাদের দেওয়া ভারত লুণ্ঠনের ছিটেফোঁটা পেয়েছে ঘুষ হিসাবে, আর সেই সূত্রে হারিয়েছে তাদের নিজেদেরও অধিকার ঐ শাসকদের কাছে,—এদিকে আমরাও যদি বুঝি ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষ আমাদের শাসকও ছিলনা, শত্রুও নয়,—তাহলে সেদিন দু'দেশের সাধারণ মানুষ সাধারণ সুবুদ্ধি নিয়েই পরস্পরকে বিনাবাধায় আলিংগন করতে পারব। কিন্তু এমন দিন কি হয়? হয়েছে ত দেখছি কোথাও কোথাও। রুশ শাসকগোষ্ঠী নিঃশেষ হতেই রুশিয়ার সাধারণ মানুষ আজ ইউক্রেনী, বেলেরুশের সংগেই শুধু নয়, কশাক, কাজাক, তুর্কমেন, উজবেক, আর্মানি-গুর্জী সবার সঙ্গেই ত মিলেমিশে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ দেশ গঠন করছে। তবে ও হল 'লৌহযবনিকা'র ওপারের দেশ—সে আমি দেখিনি। তবু আশা করব—অমন স্বাধীন মানুষের সহজ সম্পর্ক যেন একদিন ইংরেজ সাধারণ মানুষের সংগে আমাদেরও গড়ে ওঠে। কারণ, সত্যই ইংরেজ জাত ও ইংল্যাণ্ডকে আমরা ভালবাসি, ভালো না বেসে তাদের কেউ পারে না।

বিলাত দেশটা মাটির

বিলাতের পথেঘাটে

মনে পড়ে বিদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার আগে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'জাহাজ যখন এডেন বন্দর ছাড়াবে তখনই দেখবেন ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ায় এসে পড়েছেন। সবাই চুপচাপ, নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, চড়াগলায় হাসির বদলে গাম্ভীর্যের ছাপ মুখে চোখে। অথচ এরাই হাওড়া আর বোম্বাইয়ে চীৎকার করে অন্যের বক্তব্য শুনতে দেয়নি। দেশ-কালের এমনি মহিমা; পাত্রকে বদলাতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না।" কথাটা যে কতবড় সত্য টিলবেরী বন্দরে পা দিয়েই বুঝেছিলাম।

ইংল্যাণ্ডের রাস্তাঘাটে চলাফেরার অবস্থা দেখে সত্যিই আনন্দ হয়। সমস্ত কাজকর্ম কেমন সুষ্ঠুগতিতে ও নিয়মানুসারে চলে, হট্টগোল নেই, ঠেলাধাক্কা, গালাগালি নেই, আছে শুধু তাড়া। সমস্ত লোককে কে যেন তাড়া করে চলেছে আর তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পা ফেলে চলেছে সামনের দিকে। নিরন্তর ব্যস্ত, যেখানে প্রকাণ্ড কিউ দিতে হয় সেখানেও কোন চেঁচামেচি, হৈ চৈ বা অস্থিরতা নেই। সকলেই নীরবে অপেক্ষা করছে কখন তার সময় হবে। তার মধ্যে নেই অনাবশ্যক ও অশোভন অভদ্রতা। যার বেশী তাড়া থাকে সে এগিয়ে আসে এক ধাপ "আপনার কোন আপত্তি নাই তো?" বলতে বলতে। আপত্তি কেউই করে না, অনিয়মটাই নিয়ম নয় বলে। তবে এদের ব্যস্ততা সত্যিই দেখার মত। এরা ছুটে চলেছে লণ্ডনের রাস্তায় হন্তদন্ত হয়ে। এমন যে স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ি বা Escalator ভূগর্ভে নেমে যাবার, সেখানেও এরা দ্রুত নামার চেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় শীতের দেশে

শরীর গরম রাখার জন্য প্রথমে এই ব্যস্ততার প্রচলন ; তারপর হয়ে গেছে অভ্যাস। কাজ না থাকলেও কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই। যদি সারাক্ষণ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে পার তাহলে লণ্ডনে থাকার উপযুক্ত, না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে। অবশ্য পিছিয়ে পড়বার উপায় নেই ; হয় কেউ তোমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দেবে, নয়ত মাড়িয়ে যাবে sorry বলতে বলতে। একেবারে survival of the fittest, দুর্বলের স্থান লণ্ডন নয়। প্রবাদ শুনি London runs, New York drives—নিউইয়র্কের গতি তীব্রতর হয়ত ; তবে তা নাকি ক্লান্তিকর। লণ্ডন দৌড়ায়, তা প্রীতিকর ; কারণ, এ গতি প্রয়োজন, পিছিয়ে পড়তে কেউ চায় না।

লণ্ডনের রাস্তাঘাটগুলো কলকাতা থেকে বিশেষ সুন্দর নয়, প্রায় একই ধরণের। তবে পথিকদের চালচলন অনেক বেশী নিয়মানুসারী। প্রত্যেকেই নীরবে বাস-স্টপে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে—নির্দিষ্ট বাসে উঠে 'যার যেথা স্থান' চলে যাবার জন্যে। অফিসটাইম ছাড়া বাসে দাঁড়ান নিষিদ্ধ। তাও 'বারজন দাঁড়াইবেক' এর জায়গায় তেরজন নয়। বারজন হয়ে গেলেই বাস আর স্টপেজে দাঁড়ায় না, সোজা চল্‌তে থাকে। চল্‌তি বাসে ওঠানামা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ,—তার উপর অভদ্রতা। লেডীজ্ সীট্ বলে কোথাও লেখা নেই। ভর্তি হলে মেয়েরাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, পাসের সীট খালি থাকলে নিঃসঙ্কোচে পুরুষের পাশে বসে পড়ছে। তেমনি পুরুষও মেয়েদের পাশে বসতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না। সাধারণত অফিসটাইম ছাড়া রাস্তায় ভীড় দেখা যায় না ; সে ভীড়টাও বাস বা টিউব রেলওয়ের 'কিউ'তেই সীমাবদ্ধ।

এই টিউব রেলওয়েতেই কিছুটা অরাজকতা দেখা যায়। কারণ,

ট্রেনগুলি আধমিনিটের বেশী একটা স্টেশনে থামে না এবং তাদের গতি বাসের চেয়ে অনেক দ্রুত। তাই যাত্রীরা টিউবকেই পছন্দ করে। তবে রক্ষণশীলরা টিউবকে তেমন পছন্দ করেন না, বলেন "গরম লাগে।" ঐ অরাজকতায় অশোভন অভদ্রতা নেই। পাশ থেকে শোনা যায় স্টেশন-ওয়েটারের গলা—Hurry along, সশব্দে সবগুলো দরজা একসংগে বন্ধ হয়ে যায়, প্লাটফরম জনশূন্য—ট্রেণ ছুটে চলে বিদ্যুৎতাড়িত হয়ে। ভূগর্ভের এই সুড়ঙ্গবিহারী ট্রেনস্টেশনে নামতে হয় Escalator বা লিফ্‌ট দিয়ে। নামবার পথে দেওয়া আছে বিরাট একটি ম্যাপ ; গন্তব্যস্থলের গাড়ী বার করতে বিদেশীর মোটেই অসুবিধা হয় না। (তবে পরে দেখেছি—প্যারীর ব্যাখ্যাটা আরও পরিষ্কার। স্টেশনের প্রবেশ পথে গন্তব্যস্থলের নামের পাশে বসানো বোতাম টিপলেই গতিপথ ম্যাপের উপর আলো পড়ে।) প্রত্যেকটি গাড়ীর ভিতরে ম্যাপ দিয়ে বোঝান আছে গাড়ীটা কোন লাইন ধরে যাচ্ছে আর এরপর কোন স্টেশন আসছে। তবুও লোকেরা জংসন স্টেশনে পথ হারিয়ে ফেলে, আর সেজন্যই লণ্ডন শহরে সময়ের কড়াকড়ির সংগেই দেওয়া হয় ১৫ মিনিটের শিথিলতা ; অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ১৫ মিনিট বেশী সময় আপনার জন্য প্রতীক্ষা করা চলতে পারে, তার পর আর কেউ অপেক্ষা করবে না।

এই প্রসংগে আমার বান্ধবীর একটি অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল।

বেচারী বিদেশী, জানত না আমাদের সময় জ্ঞানটা কি রকম। হঠাৎ কোন বিশেষ কারণে আমাদের ইণ্ডিয়া হাউসে (India House) তার কোন একটি অফিসারের সংগে দেখা করতে হয়। টেলিফোনে যোগাযোগ স্থাপন করে অফিসার ভদ্রলোক জানালেন—বেলা ৩-১৫ মিনিটে তাঁর সংগে দেখা হওয়া সম্ভব। ভদ্রমহিলা তাতেই সম্মত

হলেন। তখন ভদ্রলোক তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন—"৩-১৫ মিনিটের বেশী দেরী হলে কিন্তু আমি অপেক্ষা করব না।" মহাবিস্মিত হয়ে ভদ্র-মহিলা (বোধহয় বাংগালী নন বলে) জবাব দিলেন, "আমি যদি সময় করে কথা দিই তাহলে সময় মতই আসব।" পরদিন ভদ্রমহিলা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় গিয়ে হাজির হলেন। আমাদের রীতি অনুযায়ী সে অফিসারটি তখন জানালেন, "আপানার কাগজটা ত এখনও টাইপ করা হয়নি,"—"আহা চাবিটা বুঝি আবার পাওয়া যাচ্ছে না,"—"আপনি না হয় একটু বসুন,"—" ওরে একটা চেয়ার দে না বসতে,"—ইত্যাদি বলে তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। অর্থাৎ বিলাতী কায়দায় সময় রাখতে ভদ্রমহিলা অসময়ে এসে গিয়েছেন।

বিলাতের রাস্তাঘাটে যেমন নেই অশোভন আচরণ তেমন নেই রাস্তায় এটা সেটা ফেলে দেওয়ার অভ্যাস। গ্যাসপোস্টের গায়ে কিছু কিছু টিনের বাক্স থাকে দেশলাইয়ের কাঠি বা পোড়া সিগারেটের টুকরা ফেলার জন্য। পুরোনো টিকিটের জন্য বাসেরই দরজার গায়ে বাক্স আর বাড়ীর জঞ্জাল ফেলার জন্য বাড়ীর সামনে কোন জায়গায় (সহজে যাতে চোখে না পড়ে) ঢাকা দেওয়া বিরাট টব। সেখানে সারা সপ্তাহের ময়লা জড় হয় আর সপ্তাহান্তে একবার করে ভারপ্রাপ্ত গাড়ীগুলি এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। ফলে শহরের পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

তবে অন্য কোনো কোনো দেশের শহরের মত লণ্ডন অত পরিচ্ছন্ন নয়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া—বিশেষ করে সুইডেন নাকি সবথেকে পরিষ্কার; ট্রেনগুলি চলে বিদ্যুতের সাহায্যে। বরফের রাজ্য, তাই এমনিতেও সহজে ময়লা হয় না। গল্প আছে, একবার এক বিদেশী ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন নরওয়ের রাস্তা দিয়ে। তাঁর কেমন সন্দেহ হোল কেউ তার পিছু নিয়েছে। পিছনে তাকিয়ে এক ঝুড়িওয়ালা ছাড়া আর কিছুই দেখতে

পেলেন না। অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে সিগারেট ধরালেন দেশলাই জ্বালিয়ে, কাঠিটা ফেললেন রাস্তায়। লোকটি তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে সেটা কুড়িয়ে নিল। ক্রমে ভদ্রলোকের সিগারেটটি শেষ হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় ফেলে দিতে সেটিও কুড়িয়ে নিল। এর পর যখন দ্বিতীয় দেশলাই কাঠিটি তুলে নিয়েও সে তাঁর সংগ ত্যাগ করল না, তখন ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করলেন,—"তুমি কে হে, আমার পিছু নিয়েছ? আর আমার দেশলাই কাঠি সিগারেট কুড়িয়ে নিচ্ছই বা কেন? না কিনতে পার ত না খেলেই হয়!" লোকটি সহাস্য মুখে জবাব দিল,—"তোমার পিছন পিছন হাঁটলে তবেই না আমি ওগুলো কিনবার পয়সা জোগাড় করতে পারব। তোমাদের মত বিদেশী লোকেরা আমাদের রাস্তাঘাট নোংরা করে বলেই না আমার চাকরীটা এখনও বজায় আছে। না হলে আমরা রাস্তাঘাট যেমন পরিষ্কার রাখতে ভালবাসি, এ কাজের জন্য লোকই রাখা হত না। আমারও একাজ মিলত না। খেতাম কি?"

ধোঁয়াময়লার রাজ্য লণ্ডন কিন্তু কলকাতা শহরের তুলনায় স্বর্গ। অথচ কলকাতা শহরের মত তাতে বোধ হয় এত ঝাড়ু ও জল দেবার ব্যবস্থা নেই। দরকারও হয় না।

যেমনি আছে পথঘাটের প্রতি দৃষ্টি, তেমনি ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপে আছে পথিকদের প্রতি সজাগ নজর—তা সে পথিক মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক। ইংল্যাণ্ড তৎপর নারী-শক্তির দেশ, তাই মেয়েদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সেদেশের কর্তৃপক্ষ রেখেছেন প্রখর দৃষ্টি। মেয়েদের যারা ছলে বলে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলতে চায় তাদের কঠোর শাস্তি বিধানের সংগে সংগে পথচলা মেয়েদের সুবিধার জন্য চা-খানা, হোটেল-খানা, প্রসূতিসদন, বিবাহ-বিচ্ছেদ পরামর্শদাতা, সাংসারিক

ও সামাজিক উপদেষ্টাসমিতির সংগে আছে রাস্তাঘাটে স্নানাগার, শৌচাগার ইত্যাদির পৃথক ব্যবস্থা, যা নাকি গোটা কলকাতা শহরে একটিও নেই। চাকুরে, ছাত্রী, গৃহিণী যে কেউ যখন বাইরে যায় হয় স্নান খাওয়া বা আনুষঙ্গিক কাজগুলোর জন্য দশমাইল পথ পেরিয়ে আবার তাদের বাড়ী ফিরে আসতে হয় না। রাস্তার পাশে, টিউব-স্টেশনে, বড় দোকানে, প্রতি চৌমাথার মোড়ে যে কোন রেস্টুরেন্টে হাতমুখ ধোওয়া, প্রাতঃকৃত্য সারার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধোপদুরস্ত তোয়ালে এবং তরল সাবান সহ আছে বাথ্‌রুমের ব্যবস্থা। একটা পেনী দরজার ফুটোর মধ্যে দিয়ে গলিয়ে হাতল ঘোরালে বাথ্‌রুমের দরজা খুলে যাবে, দশমিনিট সময় হাতে থাকলে চুল আঁচড়িয়ে ফিটফাট্ হয়ে আরও কয়েকঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ানো চলে। কলকাতার রাস্তাঘাটে চাকুরীজীবী মেয়ের ত এখন অভাব নেই। তাদের সকাল-বেলার চেহারার সংগে বিকালবেলার চেহারটা তুলনা করতে গিয়ে নিতান্ত অসংগতভাবেই ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডের সংগে তুলনাটা চোখে পড়ে।

জনতার বন্ধু পুলিশ

রবিবার সকালবেলা বান্ধবী বললেন, "নীচ থেকে দুধের বোতলটা নিয়ে এস না—আমি চাটা ভিজিয়ে ড্রইংরুমে নিয়ে যাচ্ছি—।" নেমে গেলাম নীচে। গেটের বাইরে পরপর তিনটি বোতল সাজানো, সকালবেলা গয়লা দিয়ে গিয়েছে। এবং এমনি করে প্রত্যেক বাড়ীতে প্রত্যেক দিন দেয়, কেউ ভুলেও অন্যেরটা তুলে নেয় না। খালি বোতলগুলি ধুয়ে দরজার বাইরে রেখে দিলে পরদিন ওরা তুলে নিয়ে যায়, অন্যেরা হাত দেয় না। রাস্তার পাশ থেকে খবরের কাগজ

কিনতে হলে বিক্রেতার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, টুপীতে পয়সা ফেলে দিয়ে কাগজটা তুলে নিলেই হ'ল। দোকানে জিনিসপত্র এমন ভাবে সাজানো—ইচ্ছে করলেই তুলে নেওয়া যায়, কেউই নেয় না। রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে দাম না দিয়ে চলে এসেছে কেউ, এমন কথা শোনা যায়নি। অথচ চলে আসাটা দুঃসাধ্য কিছু নয়। এমনি এদের নিয়মনিষ্ঠা, আমরা দেশে বসেও তা শুনেছি। দেখলামও তাই। তবে তার সংগে জড়িত হয়েছে আইনগত ব্যবস্থাও।

লণ্ডন পুলিশের কর্মতৎপরতার কথা বিশ্ববিদিত। একটা স্বাধীন দেশের পুলিশ দিয়ে কি পরিমাণ কাজ হয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে ওখানে। পুলিশের উপর লোকের অসীম বিশ্বাস। কারণ তারা জানে বিনা কারণে কারও উপর হামলা করা যেমন পুলিশের স্বভাব নয় তেমনি অন্যায় করে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়াও সোজা কথা নয়। অপরাধীর শাস্তি হবেই—তার হাত থেকে মন্ত্রিপুত্র হলেও রেহাই নেই। ব্যতিক্রম হয়ত ঘটে—আইনেই আছে বিত্তবান্‌দের জন্য ফাঁক। তা প্রায় ওরা মেনেই নিয়েছে। কিন্তু আইনের ফাঁক ছেড়ে আদালতের ফাঁক বড় নেই—সেখানে জাস্টিস্ ইজ জাস্টিস্—Law is no respector of persons. She is a respector of property. তাই বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে রাণীর গাড়ী ফিরিয়ে দেওয়াটাকে লোকে ওদেশে পুলিশের নিয়মনিষ্ঠা বলেই মানে। বলে না, "ব্যাটারা নিশ্চয় কম্যুনিস্ট, নাহলে রাণীর প্রতি শ্রদ্ধা নেই ?" আর গোটা পাঁচ এডিকং, আগে পিছে দুজন সার্জেন্ট, সিপাহী, গোয়েন্দা ও রক্ষী-গাড়ীর সমারোহ ছাড়াই ওদের রাজা রাণী ঘুরে বেড়ায়—দেখলে আমাদের কালো রাষ্ট্রপালরা হাসতেন।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে বিলাতের পুলিশ বাহিনী লোকের বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা হারায় না। তাই জনসাধারণও অকাতরে পুলিশকে

করে সহায়তা? লোকে জানে পুলিশের কাজ সাধারণকে সাহায্য করা, হাঙ্গামা বাড়ান নয়। যেদিন Surreyর পথে কলমটা হারিয়ে ফেললাম সংগী আশ্বাস দিলেন—'পেয়ে যাবে', বিশ্বাস হোলো না;—হাজার হোক, ভারতবর্ষের মেয়ে। লাঞ্চের পর একটি মেয়ে আমাকে নিয়ে গেল পোস্টাফিসে; কারণ একমাত্র সেখানেই আমি কলম-শুদ্ধ গিয়েছিলাম। শুনলাম—এক ভদ্রমহিলা কলমটি পেয়ে পোস্টাফিসে জমা দিতে এসেছিলেন; ওরা বলে দিয়েছে থানায় জমা দিতে। গেলাম থানায়। সেখানে তখন কোন লোক নেই—লাঞ্চের ছুটি। কিন্তু বাড়ীর বারান্দায় ঝোলান টেলিফোনে ন' মাইল দূরবর্তী ঐ অঞ্চলের হেডকোয়ার্টারের সংগে যোগাযোগ ছিল। তার মারফৎ জানিয়ে দিলাম যে কলম হারিয়েছি। তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম কলেজে। পাঁচমিনিট দেরী হয়ে যাওয়ায় ঘটনাটা অধ্যক্ষাকে বলতে হল। তিনি বললেন, "রাত্রে আর একবার থানায় যেও।" রাত্রে কর্তৃপক্ষ বললেন, "এখনও কেউ জমা দেয়নি। তবে আশা করছি শীগগিরই জমা দিয়ে যাবে।" পরদিন শনিবার বিকালে তারা টেলিফোনে খবর দিল আমাকে—কলমটা পাওয়া গিয়েছে। রবিবার ১০॥টার মধ্যে যেন গিয়ে নিয়ে আসি। রবিবার থানায় ওরা আমার নাম-সই নিলে; যে ভদ্রমহিলা কলমটি পেয়েছিলেন তাঁর ঠিকানাটা দিয়ে দিলেন। ফিরে এসে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিলাম। মনে হোল দেশের কথা—যেখানে পুলিশে ছুঁলে পর আঠার দু'গুণে ছত্রিশ ঘা, সেখানে কেউ কিছু হারিয়ে তাদের সাহায্য নেয় অথবা সাহায্য পায় কি?

লণ্ডন পুলিশের সাহায্যে পথ খুঁজে বার করা এতই সহজ যে কারোকে পথে রাস্তার নাম জিজ্ঞাসা করলে পথিক বলে দেবে— **Why do'nt you ask that Bob? He knows everything.**

পুলিশ ওদের কাছে গর্বের জিনিস। একলা কোনো মেয়ের পক্ষে রাত বারোটার পরের সময়টা যদি বাড়ী ফেরার পক্ষে প্রশস্ত সময় না হয়—রাত্রিটুকুর জন্য যে কোন থানায় ওদের আশ্রয় নেওয়া যায়, তাদের হেফাজত থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে না। শরণাগতকে ওরা সসম্মানে রক্ষা করে। তাই পুলিশী standard-এর চেয়ে মাথার উচ্চতা ১" কম হলে যোগ দিতে না পারার জন্য ছেলেদের আফসোসের সীমা থাকে না—এমনি পুলিশের জনপ্রিয়তা।

কাজ ও ছুটি

এগিয়ে এল বড়দিনের ছুটি—যার জন্য আমরা তিনমাস ধরে দিন গুণছিলাম। আমরা এখানে ছাত্রজীবন কাটাতে এসেছি তাই চার সপ্তাহের বড়দিনের ছুটি পাব বলে চাকরীজীবী বন্ধুরা আমাদের উপর ঈর্ষাসম্পন্ন। কারণ ওদেশের ছুটি বলতে এক রবিবার। সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঐ একদিন ছুটিটা সবাই প্রাণ ভরে উপভোগ করে। ওখানকার লোকেরা 'ফ্রেঞ্চ লিভ্' ভোগ করে না। ওদেশের সব থেকে বড় উৎসব ক্রীস্‌মাস (বড়দিন) ; তারই জন্য একদিন বা দেড়দিন ছুটি। আবার ঈস্টারের সময় এক বা দেড়দিন ; মে মাসের প্রথমদিকে আর একটা উৎসবের সময় একদিন। অবশ্য স্কুল কলেজগুলি প্রতি তিনমাসে একবার করে গড়ে একমাসের ছুটি পায়, গরমের ছুটিটা প্রায় তিনমাস। ছাত্র-ছাত্রীদের কথাই আলাদা। এ ছাড়া প্রত্যেক কর্মচারী বছরে ১ মাস করে পুরা বেতনে ছুটি পায় এবং সেটা সবাই পালা করে নেয়। ফলে অফিস-আদালত, দোকান, রেস্তোঁরা, কলকারখানা, সবই সারাবছর ধরে নিয়মিত চালু থাকে। দোকান বাজার অফিসটাইম আর নিয়ম মেনে চলে। ফলে রবিবার

ছাড়া অন্যদিন বাজার করাটাই নিয়ম। বাড়ীর চাকরীজীবী গৃহিণী বা অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা তাই শনিবার বিকালে হাঁফাতে হাঁফাতে অফিস থেকে বেরিয়ে আসে—সপ্তাহের বাজার বা রেশন আনার জন্য। কিংবা ছোটে কোন লাঞ্চের ছুটিতে। দোকান বাজার অফিস যেমন কড়া সময় মেনে চলে কাজের, তেমনি তার ছুটি মানে পুরোপুরি ছুটি। তাই ইংলণ্ডবাসীরা কৃত্রিম দুঃখের সংগে গর্ব করে—"এই হতভাগা রাজ্যে রাত দশটায় ক্ষিদে পেলে কোন উপায় নেই। রাত বারোটায় যদি হাঁটতে হাঁটতে জুতা ছিঁড়ে যায় তাহলে সে জুতাটার মায়া ত্যাগ করতে হবে! এ ত আর কন্টিনেণ্ট নয় যে, রাতদিন যখনই খুসী কোথাও না কোথাও একটা-দুটো প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান খোলা পাবেই। আর যদি বান্ধবীর সঙ্গ-বাসনা ত্যাগ করতে একটু দেরীই হয়ে যায়—তাহলে হেঁটে বাড়ী ফেরো, তা সে বাড়ী ১২ মাইল দূরও যদি হয়।" রবিবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বন্ধুর বাড়ী বসে আড্ডা মারার সময় নেই (অবশ্য আড্ডাটা ইংরেজ মারে না, মারি আমরা)—বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকাতে হবে—গেল বোধ হয় লাস্ট টিউব ট্রেনের সময় পেরিয়ে। যারা সারা সপ্তাহ কাজ করেছে তাদের ছুটি দিতে হবে, না হলে আবার কাজ করার শক্তি পাবে কোথা থেকে? তাই বাস, টিউব ছুটির দিনে আগেই বন্ধ হয়ে যায় পরের দিনের শক্তিসঞ্চয় করার জন্য।

বড়দিনের বিলাত

বড়দিনের ছুটিতে লণ্ডন বাস করার জন্য বান্ধবী আগেই খবর দিয়েছিলেন আর নিমন্ত্রণ করেছিলেন ওঁদের উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। উৎসবটা চলে দুদিন ধরে। আমাদের দুর্গাপূজার সংগে এর

তুলনা করা চলে। সারাবছর ধরে দিন গুণে গুণে ছেলেবুড়ো সবাই সারাবছরের সঞ্চিত অর্থ আর উৎসাহ ঢেলে দেয় এর পিছনে। আমাদের মত পটকা আর বাজীপোড়ান না হলেও এদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ভদ্রতার বাঁধা গণ্ডী না পেরিয়েও—হৈ চৈ টা বেশ করে।

শীতের সুরু হতেই পড়ে যায় দোকানে দোকানে সাজসাজ রব। রাস্তায় রাস্তায় অচল আর সচল দুরকমই বিজ্ঞাপনের ভিড়। কার কতখানি সাজবার ক্ষমতা তারই চলে প্রতিযোগিতা। অবশ্য এদের দোকানগুলো এত সুন্দর করে সাজানো যে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখার ইচ্ছে করে। বণিকসভ্যতার আসল চটক তার বিজ্ঞাপনে। তা সেদিক দিয়ে এরা এদের সভ্যতার মান বজায় রেখেছে। তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় আমাদের কলকাতার প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগের সাহেবপাড়ায়। তবে শো-কেস্ সাজানো বিদ্যায় প্যারির কাছে লণ্ডন শিশুমাত্র। যা হোক্—একেই ত এদের জিনিসপত্রের অসম্ভব দাম, তার উপর আবার উৎসবের সময় ভীড় বেশ। তবে ক্রেতারাও ক্রয় সীমার মধ্যে জিনিসের জন্যেই দোকানে ঢুকে আরও পাঁচটা জিনিস নিয়ে বেরিয়ে আসে। দোকানে যদি ভীড় বেশী হয় একের পর এক দাঁড়িয়ে যায় নিঃশব্দে, এগিয়ে যায় বিক্রেতার কাছে। দোকানে কাজ করে বেশীর ভাগই মেয়ে। পোষাকে এবং আচার ব্যবহারে তাদের সংগে ক্রেতার কোন তফাৎ নেই। তাই পাছে ক্রেতা বিভ্রান্ত হয়, মেয়ে কর্মচারী এসে জিজ্ঞেস করে—"আমি কি সাহায্য করব?" যথাসাধ্য টাকা এবং পছন্দ মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কম টাকার জিনিস কিনবে বলে ক্রেতার আদর একটুও কম নয়, আর বিক্রেতারও মেজাজ সারাদিনের পর তিরিক্ষি হয় না মোটেই।

প্রত্যেক দোকানেই নানা রকম আর নানাদামের জিনিস

আমদানী হয়। আমরা কিন্তু বিশেষ করে কিনি জামাকাপড় অর্থাৎ পুজার উপহার বলতে আমরা বুঝি জামাকাপড়, জুতা আর নিতান্ত বেশী হলে বই বা খেলনা। অবশ্য সেটা উপরি পাওনা। ওদের কিন্তু পোষাকটা কিনতেই হবে বলে মনে করে না— প্রত্যেকেই চায় দরকারী জিনিস কিনতে। যদি পোষাক বা কোট প্রয়োজন হয় তা কেনে; না হয় যার যেটা বেশী দরকার। অবশ্য উপহার দেওয়াটা এদের একটা নিয়ম, এবং সে উপহারটাও প্রয়োজনীয় জিনিস হলে ওদেশের গৃহিণীরা খুসী হন বেশী। আমাদের কোন আত্মীয়কে যদি একখানা রান্নার হাঁড়ি উপহার দি পূজার সময় তিনি নিশ্চয়ই ভাববেন তাঁর আর্থিক অবস্থার উপর কটাক্ষ করছি— এবং হয়ত তাঁর মুখও হাঁড়িপানা হয়ে যাবে। আমার একজন ইংরাজ সতীর্থা তাঁর কাকাকে উপহার দিল একটি Waste Paper Basket ছেঁড়া কাগজ ফেলবার ঝুড়ি। আমি অবশ্য এক বান্ধবীকে দিলাম একটি ছবি আঁকা চায়ের ট্রে, এর চেয়ে বেশী কেজো মানুষ হতে আমার সাহস হল না। আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে একটা কিছু উপহার দেয়। বেশ একটা লুকোচুরি চলে তাই নিয়ে। উপহারটা লুকিয়ে রাখতে হয়; কারণ নিয়ম অনুযায়ী ক্রিশমাস্ দিনের আগে কেউ তা খুলতে পারে না। একটি বিশেষ ধরণের গাছ (যেটা ক্রীশমাস্ ট্রী নামে পরিচিত) বাল্‌ব্ আর নানা রকম জরি-চুম্‌কি দিয়ে সাজান হয়। ২৫শে সন্ধ্যার আলো জ্বলতেই সবাই যায় গীর্জায় উপাসনা করতে, তারপর চলে উপহার বিতরণের পালা। (অবশ্য এ সব আমরা দেশেও দেখেছি— ফিরিঙ্গি ও ইংরেজ পাড়ায়।) মতভেদে উপহারগুলো সাজান হয় ঐ গাছটির গোড়ায়। প্রত্যেকটি সুন্দর করে রঙচঙে কাগজে মোড়া, উপরে লেখা

Daddy from Mary বা ঐ জাতীয় কিছু। ঐ মোড়কটি পাবার আগে প্রত্যেককে একটা করে ছড়া বলতে হবে। সাধারণত ঐগুলো খ্রীস্টের জন্মের বা আনুষঙ্গিক ভাবার্থ নিয়ে রচিত। অবশ্য সবটাই রুচির উপর নির্ভর করে। গাছ সাজাবার সময় ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ বাড়ীর গৃহিণী ছাড়া কেউ উপস্থিত থাকে না। উপহারগুলি জড় করা হয় সবার অলক্ষ্যে। সেই থেকেই উৎপত্তি 'সাণ্টা ক্লজ্' বা 'ফাদার ক্রীশমাসের'। ক্রিশমাস-ট্রীর উৎপত্তি যে কোথায় আমার বান্ধবীরা তার সদুত্তর দিতে পারল না কেউ। নৃতাত্ত্বিকের গবেষণা হয়ত খ্রীস্টকে ছাড়িয়ে আরও অনেক অনেক পুরনো দিনে চলে যাবে। ওদেশের সাধারণ মানুষের মন তাতে সায় দেবে না। তাদের অনেকের মতে জার্মানী হতে এর আমদানী হয় সারা ইউরোপে; সেখানে নাকি কোথাও কোথাও বাড়ীর বাইরে সার দিয়ে এ গাছ লাগান হয়। এই জেনেই তারা খুসী। আমাদেরও মানতে হয়— চারিদিকে বরফের রাজ্যে এই চিরসবুজ গাছটি একটু বৈচিত্র্যের আমদানী করে বলেই তার এত আদর।

আমাদের যেমন কেউ বা বৈষ্ণব, কেউ বা শাক্ত, কেউ বা শৈব, তেমনি খৃস্টানদেরও আছে নানারকম শাখাপ্রশাখা, নানা মতভেদ। প্রত্যেকেরই উৎসব এই বড়দিন; তা পালন নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। কেউ বা ক্রীশমাস্ ইভ্ অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে প্রধান উৎসব করে,— কেউ বা 'গোস্বামী মতে পরাহে'। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা বেশীর ভাগই করে ২৫শে ডিসেম্বর। সন্ধ্যা ও সকাল বেলা গীর্জায় গিয়ে উপাসনার পর বাড়ী ফিরে আসে। সকলেই সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে অভিবাদন করে (আমাদের বিজয়া উৎসবের মত)। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন মিলে একসঙ্গে

ভোজন করার পর উৎসব সমাপ্ত হয়। এটা নিতান্তই ঘরোয়া উৎসব, বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া এরা কাউকে তাতে ডাকে না।

সারা বছর ধরে যারা কামনা করে এই দিনটি, তারা যাতে ভালভাবে পালন করতে পারে এই উৎসব, তার জন্য অফিস, কারখানা, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায় বিকাল ৪টার মধ্যে। এতবড় লণ্ডন শহরে একমাত্র ২।১ টা ওষুধের দোকান ছাড়া আর কিছু খোলা থাকে না। ওদেশে একটা চল্‌তি কথা আছে— 'ক্রিশমাস্ দিনে ঘাসও গজায় না'— বাস-টিউব চলা ত দূরের কথা। তাই প্রধান উৎসবের কয়েকদিন আগে থেকেই রাস্তায় চলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। অফিস-টাইমমানা দোকানপাট এই উৎসবের জন্য তখন একটু বেশী সময় পর্যন্ত খোলা থাকে।

ক্রিশমাস্ কার্ড পাঠান এ উৎসবের প্রধান অংগ। সবাইকে কিছু উপহার দেওয়া সামর্থ্যের বাইরে সবারই। তাই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাইকে 'মেরি ক্রীশমাস্' আর 'নববর্ষের শুভকামনা' জানিয়ে কার্ড পাঠান হয়। দোকানে দোকানে যেমন নানারকম ছবি আর উদ্ধৃতিসহ কার্ডের ভীড়, পোস্টাফিসে তেমন কাজের ভীড়। একমাস আগে থেকেই রাস্তায়, বাসে, পোস্টাফিসের দেয়ালে বিজ্ঞাপন মারা হয়,— 'তাড়াতাড়ি পাবার জন্য, তাড়াতাড়ি পোস্ট করুন,' 'কার্ড পাঠাবার মাশুল ১½ পেনী', 'বিদেশে ৪ পেনী', ইত্যাদি। সারা বৃটেনের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি ৬২ লক্ষ। এরা প্রত্যেকেই বন্ধুবান্ধবকে যে কার্ড পাঠায় তা যাতে ঠিক সময়মত পৌছায় তার জন্য সকলের চেষ্টার সীমা নেই। পোস্টাফিসে এত বেশী কাজ জমে যে সাধারণ কর্মচারী দিয়ে করা দুঃসাধ্য।

Daddy from Mary বা ঐ জাতীয় কিছু। ঐ মোড়কটি পাবার আগে প্রত্যেককে একটা করে ছড়া বলতে হবে। সাধারণত ঐগুলো খ্রীস্টের জন্মের বা আনুষঙ্গিক ভাবার্থ নিয়ে রচিত। অবশ্য সবটাই রুচির উপর নির্ভর করে। গাছ সাজাবার সময় ছেলেমেয়েরা অর্থাৎ বাড়ীর গৃহিণী ছাড়া কেউ উপস্থিত থাকে না। উপহারগুলি জড় করা হয় সবার অলক্ষ্যে। সেই থেকেই উৎপত্তি 'সান্টা ক্লজ্' বা 'ফাদার ক্রীশমাসের'। ক্রিশমাস-ট্রীর উৎপত্তি যে কোথায় আমার বান্ধবীরা তার সদুত্তর দিতে পারল না কেউ। নৃতাত্ত্বিকের গবেষণা হয়ত খ্রীস্টকে ছাড়িয়ে আরও অনেক অনেক পুরনো দিনে চলে যাবে। ওদেশের সাধারণ মানুষের মন তাতে সায় দেবে না। তাদের অনেকের মতে জার্মানী হতে এর আমদানী হয় সারা ইউরোপে; সেখানে নাকি কোথাও কোথাও বাড়ীর বাইরে সার দিয়ে এ গাছ লাগান হয়। এই জেনেই তারা খুসী। আমাদেরও মানতে হয়—চারিদিকে বরফের রাজ্যে এই চিরসবুজ গাছটি একটু বৈচিত্র্যের আমদানী করে বলেই তার এত আদর।

আমাদের যেমন কেউ বা বৈষ্ণব, কেউ বা শাক্ত, কেউ বা শৈব, তেমনি খৃস্টানদেরও আছে নানারকম শাখাপ্রশাখা, নানা মতভেদ। প্রত্যেকেরই উৎসব এই বড়দিন; তা পালন নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। কেউ বা ক্রীশমাস্ ইভ্ অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে প্রধান উৎসব করে,— কেউ বা 'গোস্বামী মতে পরাহে'। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা বেশীর ভাগই করে ২৫শে ডিসেম্বর। সন্ধ্যা ও সকাল বেলা গীর্জায় গিয়ে উপাসনার পর বাড়ী ফিরে আসে। সকলেই সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে অভিবাদন করে (আমাদের বিজয়া উৎসবের মত)। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন মিলে একসঙ্গে

ভোজন করার পর উৎসব সমাপ্ত হয়। এটা নিতান্তই ঘরোয়া উৎসব, বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া এরা কাউকে তাতে ডাকে না।

সারা বছর ধরে যারা কামনা করে এই দিনটি, তারা যাতে ভালভাবে পালন করতে পারে এই উৎসব, তার জন্য অফিস, কারখানা, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায় বিকাল ৪টার মধ্যে। এতবড় লণ্ডন শহরে একমাত্র ২।১ টা ওষুধের দোকান ছাড়া আর কিছু খোলা থাকে না। ওদেশে একটা চল্‌তি কথা আছে—'ক্রিশমাস্ দিনে ঘাসও গজায় না'— বাস-টিউব চলা ত দূরের কথা। তাই প্রধান উৎসবের কয়েকদিন আগে থেকেই রাস্তায় চলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। অফিস-টাইমমানা দোকানপাট এই উৎসবের জন্য তখন একটু বেশী সময় পর্যন্ত খোলা থাকে।

ক্রিশমাস্ কার্ড পাঠান এ উৎসবের প্রধান অংগ। সবাইকে কিছু উপহার দেওয়া সামর্থ্যের বাইরে সবারই। তাই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাইকে 'মেরি ক্রীশমাস্' আর 'নববর্ষের শুভকামনা' জানিয়ে কার্ড পাঠান হয়। দোকানে দোকানে যেমন নানারকম ছবি আর উদ্ধৃতিসহ কার্ডের ভীড়, পোস্টাফিসে তেমন কাজের ভীড়। একমাস আগে থেকেই রাস্তায়, বাসে, পোস্টাফিসের দেয়ালে বিজ্ঞাপন মারা হয়,— 'তাড়াতাড়ি পাবার জন্য, তাড়াতাড়ি পোস্ট করুন,' 'কার্ড পাঠাবার মাশুল ১½ পেনী', 'বিদেশে ৪ পেনী', ইত্যাদি। সারা বৃটেনের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি ৬২ লক্ষ। এরা প্রত্যেকেই বন্ধুবান্ধবকে যে কার্ড পাঠায় তা যাতে ঠিক সময়মত পৌছায় তার জন্য সকলের চেষ্টার সীমা নেই। পোস্টাফিসে এত বেশী কাজ জমে যে সাধারণ কর্মচারী দিয়ে করা দুঃসাধ্য।

তাই জনসাধারণ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। অনেক ছাত্রছাত্রী, বা সাধারণ নাগরিক পোস্টাফিসে চিঠি বিলি করা, পার্শেল বাছাই করা ইত্যাদি করে থাকে (অবশ্য তার জন্যে পারিশ্রমিক পায়)। ২৫শে তারিখ দুপুর বেলাও এসব ডাক বিলি করা হয়। উৎসবের ডাকের জন্য বিদেশী বা সাধারণ ডাক একটু দেরীতে পৌছায়, তার জন্য বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না। সময় জ্ঞানটা ওদের কড়া, আর কাজগুলো সব সময় মত হয়ে থাকে বলেই একটু আধটু এদিক সেদিককে লোকে মাপ করেই চলে।

ক্রিশমাসের পরদিন অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বরকে বলা হয় 'বক্সিং ডে'। সকলেই বেরোয় আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা-সাক্ষাত করতে। পানাহারের সেদিন মাত্রা আর থাকে না। মাঝে মাঝে পা টল্‌ছে বাড়ী ফেরার সময়, এমন দৃশ্যও দেখা যায়। তবে সেটাই ঠিক নিয়ম নয়—সাধারণত যাতে মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সে চেষ্টাই লোকে করে। সুরাপানটা ওদেশে দোষণীয় না হলেও সীমা ছাড়িয়ে অভদ্রতা করাটা কামনা করে না কেউ। 'মাতাল' বললে আমাদের যে পরিমাণ ঘৃণা হয় ওদেরও ঠিক সে পরিমাণই হয়। কারণ মাতাল হওয়ার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অভদ্রতা করার একটা অলিখিত তিরস্কার। তারও চেয়ে বেশী হয় করুণা—সারা বছর হয়ত খাঁটি জিনিস পেটে পড়েনি, তাই সুযোগ পেয়ে টাল সামলাতে পারে নি। আহা বেচারা!

সবাই যখন সবাইকে শুভ কামনা জানিয়ে বাড়ী ফেরে, রাত তখন বেশ হয়েছে। পরদিন থেকে আবার অফিস আর কাজ। 'নববর্ষেও' সেখানে ছুটি নেই। ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সবাই নেচেগেয়ে নববর্ষকে অভিবাদন জানায়। তবে খুব বেশী হৈ চৈ

হয় না। কারণ সবাই ভোগ করেছে ক্রিশমাসের ছুটি আর আনন্দ। ছেলেমেয়েদের স্কুল খোলারও সময় হয়ে এল, প্রত্যেকেই এবার তৈরী হবে নতুন বছরের কাজকর্মের জন্য। তবে আমাদের মত ওদের স্কুলের বছর জানুয়ারীতে সুরু হয় না। তাই ওদের স্কুলের দিনগুলো বৎসরের সুরুতে একটু একঘেয়ে।

চিরজীবী ইংলণ্ডেশ্বর

বুধবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২। আমাদের ছবি আঁকার ক্লাশ বসেছে যথারীতি। বেলা তখন সাড়ে এগারটা। আমাদের হাত এবং মুখ চলেছে পুরাদমে। এই একটা মাত্র ক্লাশে আমরা প্রাণ খুলে হাসিঠাট্টা করতে পারি। হঠাৎ আমাদের সহকারী অধ্যক্ষা এসে ঢুকলেন। ব্যাপারটা আচম্‌কা ঘটলো। কারণ একজন লেকচারার ক্লাশে থাকতে আর একজনের ক্লাশে ঢোকা নিয়মের বাইরে। তার উপর তাঁর মুখের চেহারা জানিয়ে দিচ্ছিল অবাঞ্ছিত কিছু ঘটেছে। আমাদের মাস্টার মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে তিনি বললেন, "একটা অত্যন্ত দুঃখের খবর তোমাদের শোনাচ্ছি। আমাদের রাজা মারা গিয়েছেন।"

সমস্ত ক্লাশে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। সূঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়, হঠাৎ একজন বলে উঠ্‌ল,—"এলিজাবেথ আর ফিলিপ যে কেনিয়ার জংগলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" এর পরেই সুরু হল,—"কবে রাণী ফিরে আসবেন," "তিনি কি ভাবছেন", "রাজার মৃত্যু তিনি কি ভাবে নেবেন", ইত্যাদি কথা। একজনের কথায় চিন্তার মোড় ঘুরে গেল— "এবার তাহলে ইংলণ্ডের সিংহাসনে নূতন বংশের আবির্ভাব হোল।" প্রতিবাদ এল সংগে সংগে,—"তা কেন হবে? তুমি কি জান না

এলিজাবেথের বিয়ের সময়ই ঠিক হয়েছে যে, তার ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা ফিলিপের পদবী না নিয়ে মায়ের পদবী নেবে।" আর একজন বলল,—"মার্গারেটের এবার বিয়ে করা উচিত। কারণ সিংহাসন আর তার মাঝখানে মাত্র দুটো শিশুর ব্যবধান।"

আমরা যে কয়জন বিদেশী ছিলাম, অবাক হয়ে ভাবছি এইভাবেই কি এরা মৃত্যুকে বরণ করে। মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার পড়া একটা গল্পের কথা—The King is dead. Long live the King. ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন খালি থাকার উপায় নেই। তার প্রভাব পড়েছে জনসাধারণের উপর। রাজার মৃত্যুর সংগে সংগে নূতন রাণীর রাজ্যলাভের খবরই ছড়িয়ে পড়েছে। ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ আবার গাইবে—Long live the Queen. জনসাধারণ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে কখন রাণী ইংল্যাণ্ডে পৌঁছবেন, প্লেন কত দেরী করবে, কখন রাজ্যপ্রাপ্তি ঘোষণা হবে। প্রতীক্ষা ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—বোধহয় শূন্য সিংহাসন তারা আর সহ্য করতে পারছে না।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি কোথাও। আমরা যারা ছুটি পেতে অভ্যস্ত, দেখে অবাক হলাম ছুটির কথা কারো মুখেও এল না। খানিক পরে লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ল। সকলেই যথারীতি খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম, খেলাধুলা আর কিছুটা আলাপ আলোচনার পর ক্লাশ এ ফিরে এল। আলোচনা আর সমালোচনার সংগে আমাদের তুলিকা চলল আবার।

একটু নিরাশই হলাম। ছোটবেলায় বাবার কাছে শুনেছিলাম —একদিন হঠাৎ দুপুর বেলা গোয়ালা দুধ নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল, মাছওয়ালা আর মাছ দিতে চাইল না, কোর্ট থেকে খবর এল

মহারাণী ভিক্টোরিয়া মারা গিয়েছেন—সারা পৃথিবী শোকে মুহ্যমান। এরপর আমাদের আমলে :—স্কুলে যেতেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঘোষণা করলেন,—"আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমরা আজ দুদিন ছুটি দিলাম। স্কুল-ইনস্পেক্টরের কাছ থেকে আদেশ এলে আগামী সপ্তাহটা পুরাই ছুটি থাকবে—আমাদের রাজা পঞ্চম জর্জ মারা গিয়েছেন।" ভেবেছিলাম রাজা ষষ্ঠ জর্জের খাস রাজ্য ইংল্যাণ্ডে কোন্ না সপ্তাহ দুই ছুটি থাকবে—ফাউ পাওয়া এই ছুটি কাটিয়ে আস্‌ব লণ্ডন গিয়ে।

কিন্তু রাজা মারা গেছেন বলেও এরা কর্তব্য থেকে একচুল নড়ে না। দেশের কোথাও কিন্তু এতটুকু বাধা নেই—নিয়মিত জীবন-যাত্রা চলে যাচ্ছে সুষ্ঠুগতিতে। সবই যেন নিয়ম মাফিক। যান্ত্রিক জীবনযাত্রা নূতন রাণীকে বরণ করে নিল, যেন তাই একান্ত স্বাভাবিক। আমাদের ভাবপ্রবণ মনে মৃত্যু যে দোলা দেয় এদের কাছে তা একান্তই হাস্যকর। জীবনকে এরা নিয়েছে সহজ ভাবে, মৃত্যুও তাই স্বাভাবিক।

শুক্রবার ৮ই ফেব্রুয়ারী নূতন রাণীর রাজ্যপ্রাপ্তি ঘোষণা করা হবে। বৃহস্পতিবার রাত ৯ টায় প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের বেতার বক্তৃতায় শোক প্রকাশের সংগে সংগে নূতন রাণীর দীর্ঘজীবন কামনা করা হোল। সহকারী অধ্যক্ষার কাছে আবেদন করা হোল আমাদের পাঁচ মিনিট আগে ছুটি দেওয়া হোক চার্চিলের বক্তৃতা শোনার জন্য। খানিক ইতস্তত করার পর তিনি বললেন, "তাহলে ৫ মিনিট আগে কাজ আরম্ভ করা হোক্।"

পরদিন বেলা এগারোটায় মহারাণীর রাজ্যপ্রাপ্তি ঘোষণা। আবার সম্মিলিত আবেদন জানানো হল, "ক্লাশ থেকে দশমিনিট

সময় দেওয়া হোক ঘোষণা শোনার জন্য।" প্রিন্সিপ্যাল, সহকারী প্রিন্সিপ্যাল এবং আমাদের ক্লাশ-অধ্যাপিকা তিনজনে মিলে আলোচনা করার পর স্থির করলেন—যেহেতু এটা একটা বিশেষ ব্যাপার, বৃটিশ রাণীর অনুগত প্রজা হিসেবে এতে যোগ দেওয়া আমাদের কর্তব্য। ঠিক ঐ সময়টুকুর জন্য ছুটি দেওয়া হবে। এগারোটা বাজবার ১ মিনিট আগে প্রিন্সিপ্যাল নিজে কমনরুমের বেতার যন্ত্রটি খুলে আমাদের ক্লাসে এসে বললেন, "সময় হয়েছে।" ছাত্রীর দল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকার সংগে প্রবেশ করল কমনরুমে। ঘোষণা শুনলাম গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে; আর প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালাম—ইংল্যাণ্ডের নূতন জাতীয় সংগীত God save our gracious Queen. ইংল্যাণ্ডের অর্ধনমিত পতাকা ছয় ঘণ্টার জন্য নূতন রাণীকে সম্মান জানাল মাথা উঁচু করে। আমরা ফিরে এলাম আবার আমাদের ক্লাশে।

সকলেই এবার আশ্বস্ত হয়ে মনোযোগ দিল মৃত রাজার দিকে। কবে সমাধিস্থ হবে, কতদিন Westminister Hall এ থাকবেন, কে কে আসছে, কতজন শোভাযাত্রায় যোগ দেবে, কফিনটা কত বড় হবে, পঞ্চম জর্জের থেকে ছোট না বড়, ইত্যাদি।

রবিবার গেলাম লণ্ডন। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল সেটা হল কাল পোষাক। অর্থাৎ অনেকেই শোকের পোষাকে আবৃত। রংএর বাহার নেই। তবে যারা পোষাক জোগাড় করতে পারে নি, তারা সাধারণ পোষাকই পরেছে। আগেকার দিন হলে হয়ত একটা নিয়ম করা হত। কিন্তু আজকালকার দুর্দিনে যখন একটা পোষাক জোগাড় করতেই লোকের প্রাণান্ত তখন আর নিয়ম করা যায় না। কারণ নিয়ম ইংল্যাণ্ডের লোক প্রাণপাত করেও পালন করে।

রাজার মৃতদেহ স্যাণ্ড্রিগ্রাম থেকে ওয়েস্টমিনিস্টারে আনা তারপর উইণ্ডসরে নিয়ে যাওয়া, প্রভৃতি কাগজে কাগজে বিস্তারিত ছাপা হচ্ছে। কার কতটা শোকের পরিমাণ তাও পরিষ্কার করে ছবি দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু যেটা ওদের চোখে পড়েনি বা লক্ষ্য করে নি সেটা সাধারণ নাগরিকের কর্তব্যনিষ্ঠা। রাণীর প্রথম ইচ্ছা যে রাজার সমাধির দিন দোকানপাট, স্কুলকলেজ বা অফিস-আদালত কিছুই বন্ধ থাকবে না; সকলেই স্বাভাবিক ভাবে চলবে। রাজার সমাধির দিনে এরা একটা ছুটি আশা করেছিল; নূতন রাণীর প্রথম আদেশে তা এরা পেল না। তাতে এদের ক্ষোভ নেই। রাণীর আদেশ মাথা পেতে নেবেই। কোন লোকের মনে বা কথায় বিন্দুমাত্র আপত্তির লক্ষণ দেখিনি, কারণ এটাই এখানে স্বাভাবিক। কর্তব্য পালন করাই এখানে মৃত রাজার প্রতি বা নূতন রাণীর প্রতি সম্মান জানাবার প্রকৃষ্ট পথ।

এক সপ্তাহ ধরে ব্রিটিশ বেতার (B. B. C.) থেকে শোক-মূলক প্রোগ্রাম বেশী প্রচারিত হয়েছে বলে সেখানকার কাগজে কাগজে প্রতিবাদ উঠেছে—কেন সারা সপ্তাহ ধরে এই শোক প্রকাশ চলবে? বিশেষ করে রোগী বা বৃদ্ধ যারা বেশীর ভাগই নির্ভর করে বেতারে প্রচারিত আনন্দ-পরিবেশনের উপর তাদের পক্ষে এই শোকগাথা ক্ষতিকারক। এই হল এদের আপত্তির প্রধান কারণ। শুধু রাণী নয়, রোগী বা শিশু-বৃদ্ধের প্রতিও এরা কর্তব্য ভোলে না। প্রশংসনীয় এদের উচ্ছ্বাসহীন যুক্তিনিষ্ঠা।

বিলাতের রান্নাঘর

ঈস্টারের ছুটি কাটাবার জন্য এলাম লণ্ডনে বান্ধবীর বাড়ীতে। বান্ধবী ইংরেজ নন, কন্টিনেন্টাল অর্থাৎ ইউরোপীয়। বান্ধবীরা দুজন। দুটি বান্ধবী মিলে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে। দুজনেই চাকরী করে। সকাল ৮টায় বেরিয়ে যায় একজন আর একজন যায় সাড়ে ৯টায়, ফেরে সন্ধ্যাবেলা। আমি আসায় পরিবারের সভ্যসংখ্যা আর একটি বাড়ল। খাওয়াটা মোটামুটি সকলেই বাড়ীতে করি। দুপুর বেলায় একজন খেয়ে নেয় বাইরে আর একজন বাড়ী আসে, খেয়ে আবার চলে যায়। শুধু এরা নয়, লণ্ডনে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই তাই। অবস্থাপন্ন ঘরের কথা ছেড়ে দিলে প্রায় প্রত্যেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা সকলেই অফিস বা স্কুলকলেজ যায় সাধারণত সকালে সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত সপ্তাহে ৫ দিন। শনিবার অর্ধেক অফিস, বাকী অর্ধেক অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা হয় নাচের পার্টি, না হয় এটা-সেটা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাশোনা। রবিবার একমাত্র চার্চে যাওয়া ছাড়া পরিপূর্ণ বিশ্রাম—এই হ'ল এখানকার নিয়মিত রুটিন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এখানকার মেয়েরা এত কাজ কি করে করে? এর উত্তর পেতে হলে গ্রেট বৃটেনের জীবনযাত্রা প্রণালীর নানা সুবিধাজনক দিকগুলির সংগে রান্নাঘরের ব্যবস্থাটিও নজরে আনা প্রয়োজন।

এখানে রান্না করা হয় গ্যাসের সাহায্যে। অবশ্য কেউ কেউ ইলেক্‌ট্রিসিটিও ব্যবহার করে থাকেন। ছোট একটি রান্নাঘর। তাতে থাকে এক কোণে একটা গ্যাসের উনুন। তাতে মাপ

অনুযায়ী গ্যাস বার্ণার থাকে ৪টি থেকে ৮।১০টি পর্যন্ত। দ্বিতীয় তাকে টোস্টার; নীচে উনুন অর্থাৎ ভিতরে আগুন দিয়ে সেদ্ধ, বা ভাজা পোড়ার ব্যবস্থা। আগুন এবং রাঁধুনীর মধ্যে মাত্র একটি দেশলাই কাঠির ব্যবধান, তারপরই যত ইচ্ছা এবং একসংগে যে ক'টা ইচ্ছা রান্না করা যায়। খাঁটি ইউরোপীয় রোস্ট থেকে আরম্ভ করে খাঁটি ইরানী পোলাও পর্যন্ত সবই এক ঘণ্টার মধ্যে। এই ত গেল উনুন।

তারপর একটি বাসন ধোওয়ার বেসিন। তাতে থাকে সাধারণত দুটি জলের কল—একটি গরম জলের আর একটি ঠাণ্ডা জলের, ঠাণ্ডা জলটা প্রায়ই পানীয় জল। শীতের দিনে বিশেষ কেউ ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করে না। গরম জল আসে 'গ্যাস হিটার' থেকে। অর্থাৎ সেখানে কলের মুখটি খুলে দিলেই আপনা হতে জল গরম হয়ে বেরিয়ে আসে। এই তাপ আবার নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইচ্ছামত।

একটি বা দুটি বেশ বড় গামলা বা ঐ জাতীয় কোন পাত্রে জল ধরে নিয়ে সাবান গুঁড়ো গুলে রান্নার বাসন পত্র ধুয়ে নেওয়া হয়। বাসনপত্র বেশীর ভাগই চীনামাটির, কিছু আছে কাচের, কিছু আছে নানা রকম ধাতুর এবং রুচি অনুযায়ী কলাই করা লোহার। গ্যাসে রান্না করার দরুণ বাসনপত্রে ইঞ্চিখানেক পুরু কয়লার কালি জমে না। আর যদি বা সামান্য কালো হয় তা তোলার জন্য আছে Steel Wool অর্থাৎ লোহার তার থেকে তৈরী পশমের মত নরম একপ্রকার পদার্থ। সাবান ও ঐ Steel Wool দিয়ে দু'একবার ঘষলেই ধাতু-নির্মিত পাত্রগুলি ঝকঝকে ফর্সা হয়ে যায়। ছাই, মাটি, পাতা আর সোডার সাহায্যে প্রাণপণে রগড়াতে হয় না।

কোন একটি হুক অথবা বিশেষ শিক থেকে ঝোলে দু'তিনটি ঝাড়ন। সাবানে ধোওয়া পাত্রগুলি মোছা হয় তা দিয়ে, তারপর তোলা হয় পাশেই আর একটি আলমারীতে।

এই আলমারীগুলি রুচি অনুযায়ী দেয়ালের গায়ে লাগানো বা মেজেতে বসানো থাকে। তাতে থরে থরে সাজানো থাকে পেয়ালা, পিরীচ, গ্লাস, ডিনার ডিস্, সস্‌প্যান, ফ্রাইপ্যান ইত্যাদি। উনুন আর ঐ আলমাসীর মাঝে কখনও বা ব্যবধান থাকে দু'হাতের, কখনও বা একটি দেয়ালের। কাজেই ভাঙবার সম্ভাবনাটা খুবই কম।

আগে যে দুটি আলমারীর কথা বলেছি তার একটাতে থাকে সব কাঁচামাল অর্থাৎ ডাল, চাল, রুটি, চিনি, চা, মাংস, তরকারী ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পরিষ্কার করে গোছান আর সাজান। কারণ অগোছাল হলে ঐ রান্নাঘরে পা বাড়াবার জায়গা থাকে না। যখন যে জিনিসটা বের করা হয়, কাজ হয়ে গেলে তক্ষুনি সেটা জায়গা মত গুছিয়ে রাখার অভ্যাসও করা হয় ছোট থেকেই। ছুরি দিয়ে কাটা হয় সব জিনিস। তাই থাকে গোটা তিন চার কাঠের বিশেষ ধরনের তৈরী বোর্ড। তার উপর রেখে কাটলে টেবিলে বা আলমারীর মাথায় দাগ পড়ার সম্ভাবনা নেই।

ঐ ঘরেরই এক কোণে থাকে জঞ্জাল ফেলার জন্য একটি পাত্র। ছেঁড়া কাগজ, ফলের খোসা, খালি শিশি-বোতল যাবতীয় জিনিস জমা হয় এতে। দিনে একবার করে একে পরিষ্কার করা হয়। মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ পরিচ্ছন্নতার গুণে তাকে আড়াল করে থাকে একটি পর্দা— যাতে আবর্জনার কুশ্রীতা ঢাকা পড়ে যায়, শীতের দেশ বলে পচে না কোনো জিনিসই খুব শীগ্‌গীর। তাই আবর্জনার বালতিও স্থান পেয়েছে রান্নাঘরের এক কোণে।

রান্নাঘরের দরজার গায়ে অথবা আলমারীর ভিতর দিককার দরজায় ঝোলানো থাকে কয়েকটি 'এপ্রন' বা 'ওভারঅল' অর্থাৎ যা গায়ে জড়িয়ে নিলে রান্না বা ধোওয়া-মোছার দরুণ জামা কাপড় নোংড়া হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। সেই 'এপ্রনটি' সপ্তাহে একবার ধুয়ে নিলেই চলে।

খাবার জিনিসে ভেজাল দেওয়া এখানে কড়াকড়ি ভাবে বন্ধ করা হয়েছে। ভেজাল দেওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। তাই বৃটেনে যে-কোন খাবার জিনিস নিঃসঙ্কোচে মুখে দেওয়া যায়। গৃহিণীদের স্থবিধার জন্যে অনেক তরিতরকারি পরিষ্কার করে কোটা, ধোওয়া, মোছা অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। আলু বিশেষ বিশেষ ধরণের কাটার জন্যে বিশেষ রকমের যন্ত্র, কোরানো নারিকেল প্যাকেট করা, গুঁড়ো মশলা প্যাকেট করা, তরকারি, চর্বি, রান্নাকরা মাংস, টিনের মাছ প্রভৃতি সবই এখানে অনায়াসে পাওয়া যায়। দু' এক বেলা রান্না না করেও স্বচ্ছন্দে খাওয়ার অস্থবিধা হয় না। ছেলেমেয়েরা লাঞ্চ খায় স্কুলে। তারপর সরকার থেকে বিনা পয়সায় ⅓ পাঁইট করে দুধ দেওয়া হয় প্রত্যেককে। কর্তা গিন্নী এবং ছেলে বুড়ো ইচ্ছা করলে লাঞ্চ খেয়ে নেয় সস্তা ক্যান্টিনে। বাড়ীর রান্নার হাঙ্গামা অনেক বেঁচে যায়।

সান্ধ্য আহারের মনোরম পরিবেশে সকলকার সংগে দেখা হয়। খাওয়ায় পর প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করে বাড়ীর গৃহিণীকে সহায়তা করে। রান্না, ধোওয়া, কোটা, মোছা, সবই একজায়গায় দাঁড়িয়ে করা যায় বলে সময় বাঁচে অনেক। আর খাওয়ার ব্যাপারে স্বাদের চেয়ে স্বাস্থ্যের দিকে নজর বেশী থাকায় তেল মশলার রং-এ রান্নাঘর এবং রাঁধুনী কারোরই চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

বিলাতের নূতন সমাজ

ভারতীয়দের আড্ডাতেই ছিলেন এক ইংরেজ দম্পতির সংগে ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সদস্য। তাদের সামান্য লোককেই আমি দেখেছি—অসামান্য মনে হোল তাদের নানা কারণে। আমরা নিজেরা তর্ক করছিলাম, ওরা বসে শুনছিলেন। কাঁটা দিয়ে কফির পেয়ালার গায়ে টুং টাং আওয়াজ করতে করতে ভদ্রলোক বললেন মৃদুহাস্যে—'আচ্ছা, তোমাদের প্রগতিশীলদের মতবাদটা কিরকম?

স্বীকার করলাম—"আমরা পরিবারের প্রভাবটা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারি না। দোটানায় দুল্‌ছে ছেলেমেয়ের দল যখন কোনদিকেই সমর্থন পায়না স্বভাবতঃই সমাজ আর পরিবারের আকর্ষণটা ঠেল্‌তে পারে না। মুষ্টিমেয় প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীলদল সহজেই জিতে যায়—হিন্দুকোড্‌ নিয়েও তাই হচ্ছে। যে হতভাগ্য সমাজের এই আকর্ষণেও হার মানে না, অথচ যার সুযোগসুবিধা টাকাকড়িও প্রচুর নয়, সে হয়ে থাকে একঘরে। ধর্ম, নীতি, ঐতিহ্য, সংস্কার সবকিছুর দোহাই দিয়ে নীতিবাদীরা দেশের 'অধঃপতনকে' রোধ করেন। এ অবস্থায়ও প্রগতিকামীদের চেষ্টায় আজ দেশে সামান্য জাগরণ আস্‌ছে।"

'তোমাদের মেয়েদের ত ভোটের অধিকার আছে"—

"খুব সত্যি, কিন্তু ভোটের অধিকারই কি সব? তাত' তোমরাই জানো। তাছাড়া ভোটের অধিকার বলতে তোমাদের দেশে যা বোঝায় আমাদের মেয়েদের বেলায় তা বোঝায় না। আর এজন্যই আমাদের এরজন্য প্রাণপন চেষ্টা করতে হয়নি। যে মেয়ে প্রাপ্ত-

বয়স্কা বলে ভোট দিয়ে এল, সে কি জানে ভোট কাকে বলে? ভোট দিলে কি হবে? কার হাতে ক্ষমতা এলে কার ভাতকাপড়ের সমস্যা মিটবে সে সম্বন্ধে আমাদের মেয়েরা একেবারেই অজ্ঞ। স্বামী, শ্বশুর বা বাপভাইয়ের কথায় আমরা ভোট দিই। এখন সমাজে, সংসারে, আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে এই রাজনৈতিক অধিকারটা বর্তমানে না পেলেও কিছু আসত যেত না। যাক্‌গে, আমাদের কথা, তুমি ত অনেকদিন প্রাগ-এ ছিলে সেখান থেকে হঠাৎ চলে এলে কেন?'

'সেখানে বেশ ভাল কাজ করছিলাম। দেশটা এত ভাল লাগছিল আমাদের মনে হচ্ছিল যে, সত্যই দেশের উন্নতির জন্য আমরা কিছু করছি। কিন্তু কেমন যেন মনে হোল, আমি জাতিতে ব্রিটিশ, ওদেশের কষ্টার্জিত সমাজতান্ত্রিকতার আস্বাদ আমরা ভোগ করতে পারি না। ওরাই তার ফলভোগ করবে। আমার দেশের উন্নতির জন্য আমাদের ত কিছু কর্তব্য আছে। এখানে সবাই মিলে চেষ্টা করলে তবেই না আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

মন দিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। থামলে বললাম, 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি অক্সফোর্ডের বি, এস্‌, সি, হয়ে সামান্য বইএর দোকানে কাজ কর কেন? তুমি ত ইচ্ছা করলেই আরও ভাল কাজ করতে পার? তোমার স্ত্রীও ত তাই—ডিগ্রীধারী মেয়ে। লোকে ডেকে চাকরি পায় না আর তোমার স্ত্রী শুনলাম ভাল একটি কাগজে কাজ পেয়ে সেটা ছেড়ে দিল। কি ব্যাপার বলত?'

'কাজ ত শুধু পেলেই হোল না, মনের তৃপ্তিও ত পেতে হবে? আমার ডিগ্রীর বিনিময়ে যদি কেবল টাকাই উপার্জন

করি, আদর্শকে বলি দেওয়া হবে না কি? তার চাইতে কম টাকার বদলে চিরদিন চেষ্টা করে যাব আদর্শকে জয়যুক্ত করতে। জয় যেদিন আসবে সেদিন আমার পাওনা তাতেই সুদে আসলে আদায় হয়ে যাবে।

এ আদর্শবাদ এক সময়ে আমার নিজের দেশের মানুষের মধ্যেও দেখেছি। তারা চাইত স্বাধীনতা। এরা চায় সাম্য।

'আচ্ছা, তোমাদের ত ছেলেমেয়ে নেই, দত্তক নাওনা কেন?

'প্রথম কথা, দত্তক নেওয়াটা আমরা তেমন পছন্দ করি না। দ্বিতীয় কথা, ইংল্যাণ্ডে আমাদের মত আদর্শবাদীর হাতে ইংরাজ ছেলেমেয়ে দেবার মত সাহস নেই ঐ কর্তাদের। তাঁরা অনাথ শিশুদের বরং অনাথআশ্রমে মানুষ করবেন, তবু দেশের প্রগতি-পন্থীদের সংখ্যা বাড়াতে রাজী নন। তৃতীয় কথা, সমাজ-পরিত্যক্ত নিগ্রো বা অশ্বেতাংগ শিশু দত্তক নিলে আমাদের পারিপার্শ্বিকে তাকে যে অত্যাচার সইতে হবে তা সইবার ক্ষমতা স্বভাবতঃই তার থাকবে না। একটি অসহায় শিশুকে এনে সমাজের সব রকম প্রতিকূলতার মধ্যে ছেড়ে দিতে মন চায় না। তাই আমরা দু'জন খুঁজে নিয়েছি মনের মত কাজ, তারই মধ্যে আমাদের তৃপ্তি।'

এদের সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয় সেবার শেফিল্ডে গিয়ে। পরে এরা আমায় নিমন্ত্রণ করে আনে ওদের বাড়ীতে। সেখানে নানারকম লোকের সংগে আলাপ পরিচয় হয়। অপূর্ব এদের নিষ্ঠা আদর্শের প্রতি। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে গভীরভাবে বিশ্বাস করে এদের লক্ষ্যে এরা পৌঁছবে এবং সেদিন বেশী দেরী নেই। যখনই যা কিছু ঘটুক না কেন সবাই একত্র জড় হবে, আলাপ আলোচনা করে প্রত্যেকে কাজের ভার নেবে, আর কাজ সুষ্ঠুভাবে

শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার থেকে সরে আসবে না। পাশ্চাত্য-সমাজের আড়ষ্ট শিষ্টাচার ওদের মধ্যে অনুপস্থিত। অথচ ভদ্র ব্যবহার আর সাধারণ ভব্যতার অভাব নেই কোথাও। ওদের দেখলে আশা হয়, মনে আসে উৎসাহ, আর পাঁচজনও কাজ করবার প্রেরণা পায়।

ওদের সংঘবদ্ধতার পরিচয় পেয়েছিলাম লণ্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কার'-এর জন্মবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে। 'ডেইলি ওয়ার্কার' বিলাতের কমিউনিস্ট পার্টির কাগজ—যে দেশে সমস্ত কাগজ 'প্রেস লর্ডদের' কবলিত। বিরাট হল—যাতে দশ হাজার লোক ধরে—তাতে তিল ধারণের স্থান নেই, অথচ শৃঙ্খলায় সভাক্ষেত্র যেন রণক্ষেত্রকেও হার মানায়। দেশবিদেশ থেকে এসেছে নানা দল ও মতের প্রতিনিধি কাগজটিকে অভিনন্দন জানাতে। সবাই একের পর এক বক্তৃতা করে যাচ্ছেন, শ্রোতারা নিঃশব্দ শ্রদ্ধায় শুনে যাচ্ছে। যারা জায়গা পায়নি তারা পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। হলের সামনের জনতা এবং তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ, অথচ কাউকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম এদেশের কমিউনিস্টরাও দেখছি ইংরেজই, শৃঙ্খলা নিয়মের ভক্ত, চেঁচামেচি নেই। হঠাৎ কানে গেল—'১০০০ পাউণ্ড আমাদের বরাদ্দ (Quota), তাড়াতাড়ি পুরণ করুন'। পার্শ্ববর্তিনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? তিনি অত্যন্ত নীচু গলায় জবাব দিলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টির তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে।'

'ডেইলি ওয়ার্কার' ছাড়া অন্য সব কাগজ চালায় মুনাফাদার মালিকেরা। যুদ্ধের পূর্বে বলা হত, অন্ততঃ ২০ লক্ষ পাউণ্ড না হলে বিলাতে কোনো দৈনিক কাগজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তারপরেও মালিকদের বিজ্ঞাপন না পেলে তা চালানো যায় না। এজন্য এখন

বলা হয় বিলাতে মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার আছে —অবশ্য সে মানুষের থাকা চাই ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। যা'ই হউক 'ডেইলি ওয়ার্কারে'র ততটা টাকা নেই। তা চলে মজুরের ও পাঠক সাধারণের চাঁদায়, সমবায়-নীতিতে। শুনলাম, '১ পাউণ্ড নোট আর কার আছে? নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি; আর ১৫ মিনিট মাত্র সময়, 'কোটা' পুরণ হতে এখনও ১০০ পাউণ্ড বাকী।' 'এই যে আরও ৫ মিনিট—'

'আচ্ছা এবার দশ শিলিং নোট—তাড়াতাড়ি—সময় নেই—'

'এবার ২½ শিলিং। আচ্ছা, ১ শিলিং.........'

সময় শেষ হয়ে গেল। আরও দুএকজন বক্তার বক্তৃতার পর সভাপতি জানালেন—'চাঁদা উঠেছে ১৩০০ পাউণ্ড'।

এবার পার্টির আবেদন সভ্য সংগ্রহ করা। 'আপনার পাশের ভলান্টিয়ার এর কাছ থেকে বই নিয়ে মেম্বার হোন, আমাদের কাগজের শক্তিবৃদ্ধি করুন।'

অন্যমনস্ক হয়ে বেরিয়ে এলাম ভাবতে ভাবতে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার কথা। এ একটা নূতন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে।

আর একটি অভিজ্ঞতাও এ প্রসঙ্গেই বল্‌তে পারি।

বান্ধবীরা তৈরী, ওদের সংগে যেতে হবে চার্চে, তাদের এক বান্ধবীর বিয়ে। কনের বয়স বছর ৪৮, ছেলেরও তা'ই। কনে অনেককাল নার্স ছিলেন, বিয়ের সময় ছিল না। এবয়সেও উভয়েই ঘরবাঁধার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রভাব এড়াতে পারেন নি। বর ছিলেন মিলিটারীর হোমরাচোমরা, পয়সা-কড়ির কারোরই কমতি নেই। যা হোক, বাড়ী ফেরার সময় বান্ধবীরা ভয়ানক হাসছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার?'

ওরা বললে, 'কেন, তুমি কি শোন নি, বিয়ের কনে কি বললে?

'কই না ত?'

'ও বলছে—এ বয়সেও ও কুমারী আছে।'

মহাবিস্মিত হয়ে বললাম, 'তাই জন্যে তোমরা এত হাসছ? না থাকলেই ত আশ্চর্যের কথা—আহা, অমন নিরীহ গোবেচারা ভদ্রমহিলা।'

বান্ধবী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার স্বামী কি বলেন জান? 'That man must be crazy in marrying her.'

আমি বললাম, 'এ কথার মানে? বিয়ে ত লোকে কুমারীকেই করে থাকে? আমাদের দেশে ত বরং শুনেছি—ছেলেরা যার সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিয়ে করতে দ্বিধা করে; তারা নাকি গৃহস্থবধূ হওয়ার উপযুক্ত নয়।'

'আমাদের ছেলেরা বলে—Something must be wrong with her. Nobody wanted her before.'

কথাটা আমি বলেই ফেললাম, 'ঐরূপই যদি তোমাদের ধারণা তাহলে তোমাদের দেশে অনূঢ়া নারীর সন্তানও নিশ্চয়ই জন্মে। আর তখন অবস্থা দাঁড়ায় কি? সেই মায়ের, সেই শিশুর?'

'সম্ভব হলে মা দায়িত্ব না নিয়ে নিজে কাজকর্ম করে, ছেলে মেয়ে কোনো আত্মীয়ের কাছে বা শিশুসদনে প্রতিপালিত হয়। তারপর যেমন হয়—একদিন হয়ত সেই মা'ও বিয়ে করে পুর্বসন্তান সহই। আর এরূপ ব্যবস্থা না হলে অভাগিনী মা সন্তানকে দেয় সরকারী অনাথাগারে। মোটের উপর সেখানেও সুব্যবস্থা আছে। অনেক সময় সেখান থেকেই অনেক দম্পতি পোষ্যহিসাবে ছেলেমেয়ে

গ্রহণ করে, লালনপালন করে। সমাজে, সংসারে সে সব শিশু তাদের সন্তান বলে গ্রাহ্য হয়।'

বুঝলাম সমাজে কে অনূঢ়া মা, কে অনূঢ়া মা নয়, তা নিয়ে কলহ বেশী নেই। আর সন্তানদেরও তাই 'জারজ সন্তান' বলে দুর্ভাগ্য ও অপমানের বোঝা বইতে হয় না। মানসিক ও আধ্যাত্মিক অসুবিধা হয়ত এসব শিশুর হয়—মাতৃহীন পিতৃহীন শিশুরও ত তা কতকটা হয়। কিন্তু মোটের উপর, জারজ শিশুরা সমাজের সম্পদ ; তাদের খেয়ে পরে থাকবার দায়িত্বও এজন্য জন্মাবধি অস্বীকৃত নয়।

সুনীতি-দুর্নীতি নিয়ে আমি কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারব না। একদেশে যা সুনীতি, অন্যদেশে তা দুর্নীতি। আবার এককালে যা সুনীতি, অন্যকালে তাই হয় দুর্নীতি। আমার মনে হয়েছে—মোটের উপর আমরা মেয়েদের 'সতীত্ব' ও 'একনিষ্ঠতা' নিয়ে কড়াকড়ি করি, পুরুষের বেলা একনিষ্ঠতার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে সমাজে সুনীতি-দুর্নীতির যা তারতম্য সে হচ্ছে উনিশ-বিশের তারতম্য। কোনো সমাজ উনিশের কোঠায়, আবার কোনো সমাজ বিশের কোঠায়। হয়ত ক্রমশই নীতি জিনিসটা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম স্বীকার করে একটা নূতন স্বচ্ছন্দ ভিত্তি আশ্রয় করবে। যা'ই হোক্ ভবিষ্যতে, অন্তত পিতামাতার সুনীতি-দুর্নীতির বালাই সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎকে বিষাক্ত করবে না, অন্ধ করবে না।

এই ভবিষ্যতের মানুষদের 'মানুষ করার' চেষ্টায় আমার মনে হয় আমাদের দেশের চেয়ে ও-দেশের মানুষ বেশি সচেতন, বেশি অগ্রসর। আর আমি শিশুশিক্ষার শিক্ষিকা—নিজেরও আছে মানুষ করবার মত ছেলে, তাই যেখানে যে জাতিকে

দেখি শিশুশিক্ষায় যত বেশি যত্নশীল সে জাতিকেই তত বেশী শ্রদ্ধা করেছি। তারাই ত ভবিষ্যৎ মানুষ গড়ছে।

ছেলে কি করে 'মানুষ' হয়

লণ্ডনে যে দু'একটি স্কুল সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে তার একটায় আমি কয়েক সপ্তাহ কাজ করেছি, আর দু'একটা দেখতে গিয়েছিলাম। গ্রামাঞ্চলে সারের (Surrey-র) একটি মফঃস্বলের স্কুলের (County School) অভিজ্ঞতায় দেখতে পেলাম ছেলেমেয়ের ভেদাভেদটা সে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নেই। সরকারী স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে বিনা খরচায় পড়াশোনা করতে পারে সবাই, তবে অনেকেই সুযোগ গ্রহণ করে না। একদিন একটি মেয়ে তার শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা বলাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'সরকারী স্কুলে বিনা বেতনে পড়তে ত পার।'

'ওরে বাবা! সেকথা বোলো না, পড়তে পারি সহজেই। কিন্তু চাকরী করতে হবে সরকারের ইচ্ছামত।'

'তা করলেই বা চাকরী, কাজ যখন করবেই তখন সরকারী চাকরী ত ভালই।'

'সে জন্যে নয়। সরকারের মর্জি ত; হয়ত কোন শ্রমিক এলাকায় দিয়ে দিল কাজ করতে। তখন ত আর উপায় থাকবে না। আর ওদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করান সাংঘাতিক ব্যাপার। তার চেয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করব, যখন ইচ্ছা ছেড়ে দেব—'

আশ্চর্য লাগল। কিন্তু পড়াশুনার সুযোগ কি সত্যই সে গ্রহণ করতে চায়?

সারে কাউণ্টি কাউন্সিল-এর যে স্কুলটি আমি দেখতে গেলাম, তার বয়স অনেক বেশী হলেও ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী নয়। প্রতিটি ক্লাশে জনা ২০ করে ছাত্রছাত্রী, প্রত্যেকেরই কিন্তু বেশ সুস্থসবল হাস্যোজ্জল চেহারা। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ছাত্রীরা স্বাগত জানাল। প্রতিটি ক্লাশে নিয়ে গেলেন সহকারী অধ্যাপিকা। ছাত্রছাত্রীদের বয়স কারো ১৩র বেশী নয়। এখানের স্কুল শেষ করে ওরা যাবে হয় গ্রামার স্কুলে, না হয় কোন টেকনিক্যাল স্কুলে। সাধারণ ছেলেরা তা'ই করে।

একটু বড় যারা তাদেরই জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কি জানতে চাও?'

ওরা বললে, 'ইণ্ডিয়ার কথা কিছু বলো—কেমন সে দেশ, সেখানকার ছেলেমেয়েরা কি করে?'

বললাম, 'ঠিক তোমরা যা কর, ওরাও তাই করে—পড়াশোনা, দুষ্টুমি, আর নূতন দেশের লোক দেখলে বইয়ের পিছনে মুখ লুকিয়ে হাসা—' কথা শেষ হবার আগেই সশব্দে হেসে উঠল গোটা ক্লাশ। যাদের দিকে তাকিয়ে বলছিলাম সে বেচারারা মুখ লুকিয়ে রইল লজ্জায়।

বললাম, 'ভারতবর্ষের ম্যাপটা বের কর। তাতে তোমাদের দুটি পরিচিত জায়গা পাবে; একটি হিমালয়, আর একটি আমার জন্মভূমি বাংলা।'

একজন বললে, 'তোমাদের দেশে নাকি ভয়ানক গরম?'

বললাম, 'বলত হিমালয় কথার মানে কি? বরফের দেশ, কাজেই আমাদের দেশে বরফেরও কমতি নেই।'

ছোটদের ক্লাশ দেখলাম। সেদিন ওদের Free activity অর্থাৎ

যা খুশী করো'র ক্লাশ। কেউ বা ছবি আঁকছে, কেউ অঙ্কের বই নিয়ে বীচি দিয়ে মালা গাঁথছে, কেউ শেলাই করছে—যার যা খুশী। শিক্ষয়িত্রী আমাকে নিয়ে যেতেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ,সমস্বরে অভিবাদন করল। এদের বয়স ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে। আড়ষ্ট হোল না মোটেই। একটি মেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল তার সীটের পাশে—'আমি পড়ব, তুমি শুনবে এস।' পড়া হয়ে গেলে বলল, 'জানো ঐ যে টবে আমাদের ফুল ফুটছে ওর গাছগুলো আমরা পুঁতেছি। জল দিই, এবার ওরা ঐ 'বি' সেকশন হেরে গিয়েছে।'

ওর পাশ থেকে আর একটি ছেলে বলল, 'আমার পড়া শুনবে না বুঝি?'

বললাম, 'শুনব বইকি। তার আগে বল দেখি—তোমার স্কুলে আসতে ভাল লাগে?'

'লাগে। তবে আমার চাষা হ'তে আরও ভাল লাগে।'

এবার 'বি' সেকশন থেকে বলে উঠল, 'তুমি বুঝি আমাদের দিকে মোটেই আসবে না?'

গেলাম ওদিকে। একটি ছোট মেয়ে বলল, 'তোমার দেশ থেকে আসতে ক'দিন লাগে? তোমার জল দেখে ভয় করে নি?'

যখন বললাম, 'না ভয় করে না,' ও বলল, 'বড় হয়ে আমি জাহাজের ক্যাপ্টেন হব, আর জাহাজ চালিয়ে তোমাদের দেশে যাব।'

এরপর ওদের আঁকা ছবি দেখলাম। সবারটাই দেখতে হবে—না হলে নিস্তার নাই, অভিমান করবে।

এবার আমরা গেলাম পাশের ক্লাশে ব্যায়াম দেখতে। এই

ক্লাশের মাস্টার মশাই লাইন করে ছাত্রদের বাইরে নিয়ে গেলেন। ছেলে আর মেয়ের দল দু'ভাগ হয়ে গেল—প্রতিযোগিতা হবে। একবার জিতল ছেলেরা, একবার মেয়েরা। ধরাধরি করে খেলার সরঞ্জামগুলো ওরাই নিয়ে গেল বাইরে, আবার ওরাই আনল ভিতরে। কয়েকজনে শোনাল কবিতা। অনেকেরই জিজ্ঞাস্য, 'তোমাদের ছেলেমেয়েরা কি করে?' তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক। ওরা প্রশ্ন করার সময় বা আমার কথায় হেসে উঠবার সময় কেউই কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর মুখের দিকে চেয়ে অনুমোদন নেয় না। বোঝা গেল মাস্টারমশাইদের ভয়ে তটস্থ হওয়াটা ওদের ধাতস্থ হয়নি এখনও।

একটি মেয়ে এসে বাসে উঠিয়ে দিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'এই স্কুল শেষ করে তুমি কি করবে?'

ও জবাব দিলে, 'এখনত কিছু ঠিক করিনি।' জবাব দিল বেশ বিজ্ঞভাবে।

এই স্কুলেরই একটি ছেলে—বয়স তার তের বৎসর। আমাদের কলেজে প্রায়ই আসত, নানারকম প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর মডেল তৈরী করতে। ওরা জনাকতক বন্ধু মিলে একটা মিউজিয়ম করেছে সেজন্য। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন তুমি কি করছ?'

'কৃষক হবার জন্য এগ্রিক্যালচারাল কলেজে ভর্তি হব; তার ট্রেনিং নিচ্ছি।'

'শুনলাম তুমি গ্রামার স্কুলে পড়তে গিয়েছিলে, তার কি হল?' —বললাম হাসতে হাসতে। ও লজ্জায় পালিয়ে গেল। ব্যাপারটা আমরা আগেই শুনেছিলাম। ওর বাবার ইচ্ছা ছিল ডেভিড গ্রামার স্কুল পাশ করে ডাক্তারী পাশ করে। তাই সেখানে নিয়ে যান।

সেখানের রীতি অনুযায়ী অধ্যক্ষ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি এ লাইনে আসতে চাও কেন?'

ও ক্রন্দন-কণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমি ত চাইনি আসতে, আমি চাইনি।'

অধ্যক্ষ ছেলের বাবাকে ডেকে বললেন, 'পড়বে যখন ডেভিড, অতএব লাইনটা ওই বাছবে।'

ডেভিড এসে তাই এখন ভর্তি হয়েছে এগ্রিক্যালচারাল কলেজে।

লণ্ডনের যে স্কুল সম্বন্ধে আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটি একটি নার্সারী স্কুল আর "কিণ্ডারগার্টেন" স্কুল। এখানে যারা পড়ে তাদের বয়স ২॥ থেকে ১০। এ স্কুল যারা শেষ করে অন্য স্কুলে পড়তে যায় তারা শেখে ইংরাজী সাহিত্য, অঙ্ক, গোটা গ্রেট ব্রিটেনের মোটামুটি ইতিহাস, ইউরোপের ভূগোল, কিছু জ্যামিতি, পৃথিবীর প্রাক্-ইতিহাস, ছবি আঁকা, গল্প লেখা, কিছু মাটির কাজ। ও বয়সের ছেলেমেয়েদের চেয়ে এরা এই স্কুলে একটু বেশীই শেখে এবং সে শেখার ভিত্তিটা দৃঢ়।

এই স্কুলের কাজকর্ম চলে মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে। সে পদ্ধতির প্রধান নির্দেশ হল—'ছাত্রছাত্রীকে অনুসরণ কর, আদেশ করো না।' ব্যাপারটা এতই কঠিন যে সাধারণত যারা শিক্ষকতায় অভ্যস্ত তাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়'—এই হ'ল এর মূল নীতি।

যেমন, ছাত্র ছাত্রীরা ভয়ানক গোলমাল করছে, অতএব এস খেলা যাক্ 'Silence game' অর্থাৎ 'চুপ চুপ খেলা।'

প্রধান নিয়ম হল—শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে ছোট্ট ছাত্রীটি

পর্যন্ত চুপ করে থাকে। শিক্ষক আংগুল দিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'অমুক আমার কাছে এসে কাণে কাণে একটা কথা শুনে যাও। নিঃশব্দে আসবে নিঃশব্দে যাবে, আমি যা বললাম শুনে তোমার বিশেষ বন্ধুর কাণে চুপিচুপি বলবে, আর সেই বন্ধুটি এসে আবার আমার কাছে বলবে। আমিও কথা বলব যাতে অন্যে না শুনতে পায়।' এমনি করে চলে এ খেলা। ছেলেমেয়েরা এতে অফুরন্ত আনন্দ আর উৎসাহ পায়। রোজ খেললেও এ খেলা একঘেয়ে হয় না। আর এ নিয়মে পড়া ধরলে তাও ওরা উৎসাহের সংগে শিখে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই ক্লাশে ফিরে আসে শান্তি আর শৃঙ্খলা। আমি আমার বর্তমান ছাত্রীদের নিয়েও এ খেলায় বেশ ফল পেয়েছি।

এ সব স্কুলে ঘণ্টা বাজে না। বাচ্চারা নিয়মিত স্কুলে আসে সাড়ে ৯টায়। শিক্ষয়িত্রীদের হাজিরা দিতে হয় আরও আগে। প্রতিদিনই ছেলে মেয়ে এবং শিক্ষয়িত্রীদের অসুবিধাগুলো নিয়ে আলোচনা হয় স্কুল বসবার আগে। বাচ্চারা মাঠে খেলতে যায়। দশটা না বাজা পর্যন্ত পালা করে একজন ওদের দেখাশোনা করেন। চিরকালই আমি ছেলেমেয়েদের সংগে ভাব জমাতে ভালবাসি— কাজেই ওদের সংগে মিশতে আমার মোটেই দেরী হয়নি। দাঁড়িয়ে থাকলেই হল, দু'জন চারজন এসে বলবে, 'আমাকে একটু ঘুরিয়ে দাওনা। (Please, May I have a twist)', আর যায় কোথায়। একবার সুরু হলে সবাই এসে ধরবে। তারপর মাঠের এপার থেকে ওপার অবধি ছোটা, নয়ত লুকোচুরি খেলা চলে। এবার প্রধান অধ্যাপিকা এসে জোরে হাততালি দিতেই সারা মাঠে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দে লাইন করে সবাই রওয়ানা হয় স্কুলবাড়ীর দিকে। পথে পড়ে চার্চ; ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত যারা, তারা চার্চে যায়

উপাসনার জন্য। ২॥ থেকে ৬ যাদের বয়স তারা যায় পাশের বাড়ীর বাথরুম ব্যবহার করতে।

বিরাট একটি র‍্যাক ; তার গায়ে বিভিন্ন জায়গায় ওদের নাম লেখা। অনেকেই পড়তে পারে না, কিন্তু জানে কোথায় তার নাম আছে, একটুও ভুল হয় না। এক বাক্সভর্তি coat-hanger আছে। প্রত্যেকে কোটটি খুলে একটি hanger-এ ঝুলিয়ে তার নাম লেখা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখে। তারপর সুরু হয় কাজ। প্রত্যেকেই জানে কোথায় কি রাখা হয়। যার যেটা খুশী নিয়ে খেলতে বসে যায়, সে এক দেখার মত দৃশ্য। কেউ বা রঙীন পেন্সিল নিয়ে ড্রইং করছে ; কেউ বা কাঠের সিলিণ্ডার নিয়ে তা খাপে খাপে ঠিকমত বসাবার চেষ্টা করছে ; কেউ বা সাবান আর ব্রাশ দিয়ে প্রাণপণে টেবিলের উপর ঘষছে পরিষ্কার করার জন্য ; কেউ পালিশ করছে কাঠের যন্ত্রপাতি ; কারোর হাতে রংএর তুলি আর প্লেট—'আমায় একটু রং দাওনা (Please, may I have some paint),' কেউ বা চুপ করে বসে আছে, জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কিছু করবে না ?' বয়স ওর ৩ বছর। বলল, 'আমি ছবি আঁকব।' 'তা এখন ত ওরা আঁকছে, তুমি তারপর এঁকো। চল ততক্ষণ আমরা অন্যকিছু করি।'

ও তাড়াতাড়ি যে আঁকছিল তার কাছে গিয়ে বলল, 'তোমার হয়ে গেলে ব্রাশটা আমায় দেবে ?' (Please, may I have the brush after you.)

'নিশ্চয়ই, অবশ্য যদি তখন আরও ছবি আঁকার সময় থাকে'—(Oh, yes, if there is time enough to do it.) বয়স তার ৪ বছর।

একটি ছেলে, নাম তার রবার্টস্, সেদিন সবে তার তিন বছর পুরল। সেও কিন্তু চেঁচামেচি বা ঝগড়াঝাটি করে না। একদিন তাকে একটা মানুষ এঁকে দিয়েছিলাম, এরপর থেকে সব কিছু ফেলে আমার কাছে ছুটে আসে আর বলে, 'আমায় একটা মানুষ আঁকতে শিখিয়ে দাও ত?' নয়ত বলবে, 'আমি আঁকছি, তুমি আমার কাছে বস।'

ধীরে ধীরে—বেলা যখন পৌনে বারোটা—সকলেই আবার লাইন করে রওয়ানা হল। তার আগে বলা হবে, 'এবার যাবার সময় হয়েছে, চল আমরা সব গুছিয়ে রাখি।' ব্যস, প্রত্যেকেই যার যার যন্ত্রপাতি—যা নিয়ে কাজ করছিল—ঠিক জায়গায় রাখে। যদি কাগজের টুকরো পড়ে থাকে তা নিয়ে 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' তে ফেলে দিয়ে আসে। যাবার জন্য তৈরী হল সবাই। যেতে হয় বড় ক্লাশের পাশ দিয়ে, কারণ একই বিরাট হলের মধ্যে সব ক্লাশগুলি বসে; কেউ কারোর অসুবিধা সৃষ্টি করে না। জোরে কথা বলে না, চুপচাপ গিয়ে ঝোলানো র‍্যাক থেকে কোটটি নিয়ে পরে নেয়। ওরা যখন বাইরে চলে যায়, বড় ছাত্রছাত্রীরা (বয়স ৭ থেকে ১০) তখন চেয়ার টেবিল গুছিয়ে ডিনার-এর জন্য তৈরী হয়, আর ছোটদের জন্য একটা করে নীচু ক্যাম্পখাট পেতে রাখে। বাচ্চারা ফিরে এলে এক বোতল করে দুধ (সরকার থেকে বিনা পয়সায় পাওয়া) খেয়ে নিয়ে লাঞ্চ খেতে যায়। সে খাবার ব্যবস্থাটাও কিন্তু বেশ অভিনব। একটা টেবিলে খাবার ভর্তি পাত্র আর প্লেট রাখা হয়। প্রত্যেকে একটা করে প্লেট নিয়ে নিজেই চামচে দিয়ে আন্দাজ করে খাবার নিয়ে আসে, কেউ পরিবেশণ করে না। (নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে,

তিন চার বছরের বাচ্চারা নিজ হাতে খাবার নিয়ে খেতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়—ওদের হাতে দায়িত্ব দিলে ওরা কত সহজে আর সুন্দর করে তা পালন করতে পারে।) আবার খাওয়া হয়ে গেলে প্লেটটি অপরিষ্কার প্লেট রাখবার জায়গায় রেখে আর একটি প্লেটে মিষ্টি নিয়ে নেয়। বললে হয়ত অনেকেরই বিশ্বাস হবে না, আমি যে তিন সপ্তাহ ঐ স্কুলে ছিলাম তার মধ্যে একটি শিশুকেও আমি একটি প্লেট ভাঙতে বা একটি চামচ হারাতে দেখিনি। এমনই এদের আত্মনির্ভরশীলতা। (স্কুলে খাওয়ার জন্ম সপ্তাহে ৫ শিলিং করে দিতে হয়)।

খাওয়ার পর বিশ্রাম। বড়রা যার যা খুশী করে। কেউ বা ছবি আঁকে, কেউ বা গল্পের বই পড়ে। বেলা ১-৩০ থেকে ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত আবার খেলা। ২-৩০ থেকে ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত আবার যার যা খুশী করা। ৩-৪৫ মিনিটে আবার বলা হয়, 'এস আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি'। নিজের নিজের জিনিসপত্র এমন কি টেবিল চেয়ার পর্যন্ত। ছোট ছোট টেবিল চেয়ারগুলি সবই লোহার উপর রং করা, ওজনে হাল্কা, নাড়াচাড়া করতে শব্দ হয়। অথচ ঐগুলিই রাখার সময় ছেলেমেয়েরা শব্দ মোটেই করে না। নিঃশব্দে কাজ শেষ করে কোট গায় দিয়ে বাড়ী যাবার জন্ম তৈরী।

বড়রা থাকে আর একটু সময় বেশী—৪-৩০ পর্যন্ত। মণ্টেসরী পদ্ধতিতে এই স্কুল চালানোর বিশেষত্ব হল 'ফ্রি য়্যাকটিভিটি'র মধ্যেও চমৎকার সহজ শৃঙ্খলা। কেউ জোরে কথা বলে না, একটু শব্দ হলে পাশের ছাত্রটি বলে উঠে, 'তুমি অন্যের কাজে ব্যাঘাত করছ।' প্রত্যেকেই জানে কার কি কাজ। দুষ্টুমি যে করে না তা নয়, কারণ ওটা ছেলেমেয়েদের ধর্ম। তবে তার মধ্যেও তারতম্য আছে।

একদিন একটি ছেলে একটি মেয়েকে ধরে এনে বলল যে, 'দেখত, সারাক্ষণই খালি ওর অসন্তোষ। ওকে বুঝিয়ে দাও না যে, কেবল অসন্তোষ করলে কোন কাজ হয় না।'

পড়াশোনার কি অখণ্ড মনোযোগ তার প্রমাণ পেয়েছিলাম প্রথম দিন ঐ স্কুলের সংগে পরিচিত হতে গিয়ে। আমি আর আমার সতীর্থা দুজন বেলা সাড়ে দশটায় ঐ স্কুলে যাই, আর ১১টায় ফিরে আসি। ঢোকার রাস্তায় একটি মেয়ে তার লম্বা সংখ্যা গোণার মালা ছড়াটি টান করে ছড়িয়ে ১, ২, ৩...গুণে যাচ্ছিল; আর প্রতি দশক আর শতকের পাশে নম্বর লেখা কার্ড বসিয়ে যাচ্ছিল আরেকটি মেয়ে। আধঘণ্টা সে হলঘরে থেকে সবার সংগে কথাবার্তা বলে আমরা চা খেয়ে (সে চা পরিবেষণ করল স্কুলেরই দুটি ছেলেমেয়ে) ফিরে আসার সময়ও দেখি ওরা গুণেই চলেছে—পৌঁছেছে ৮৩০ পর্যন্ত। এর মধ্যে একবারও আমাদের দিকে তাকায় নি এবং শেষ পর্যন্ত যে আমাদের দেখেছে তারও কোন পরিচয় পাইনি।

ওরা যখন লাইন করে বাইরে যায় প্রথম যে থাকে—তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক—২॥ বছর অথবা ১০ বছর, দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকলে একে একে না যাওয়া পর্যন্ত। সকলের যাওয়া হয়ে গেলে একবার পিছন ফিরে সে দেখে নেয় কেউ আছে কি না, তারপর দরজাটি বন্ধ করে তাদের অনুবর্তী হয়। জোরে হাততালি—সে ছাত্রেরই হোক্ আর শিক্ষয়িত্রীরই হোক্—শোনার সংগে ক্লাশে অথবা খেলার মাঠে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা—এবার কিছু একটা নির্দেশ শুনতে হবে। একটি ছেলে একটি মেয়েকে ঠেলে যাচ্ছিল, ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন অধ্যক্ষা, 'মাইকেল,

লীডাকে ঠেলছ'? কিন্তু জানো ত লেডীজ ফার্স্ট।' ছেলেটি একটু সরে দাঁড়াল। লীডা চলে যাওয়ার পর তার পিছনে এগোল।

এই যে নিয়মনিষ্ঠা, আত্মনির্ভরশীলতা আর সময় জ্ঞান, এগুলো যেমন এই শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষত্ব, তেমনি তা বিশেষত্ব হবে সে জাতির যে জাতি গড়বে এরা বড় হয়ে।

ছোটবেলায় পড়েছিলাম বিলাতের স্কুলে বেত-মারা আইন করে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানকার মিশনারী স্কুলগুলো দেখে ভাবতাম—এরা যদি ওদের দেশের নিয়মেই পড়াশোনা করায় তাহলে 'বেতঘর'টা ওদের স্কুলের প্রধান শাসনযন্ত্র কেন? আর ভাবতাম—ওসব গল্পকথা। বেত-মারা উঠিয়ে দেওয়া হলে ওরা ছেলে 'মানুষ' করে কি করে? যে যত বেশী মেরে বেশী সংখ্যায় বেত ভাঙতে পারবে, ততই না তার গুরুমশায়গিরিতে প্রমোশন হবে? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর রেলিং পিটিয়ে মাস্টারীগিরিতে হাত মক্সো করছিলেন, আর আমরা ত কোন্ ছার! Cane Merchant বললে আমার ত প্রথমেই মনে পড়ে—মাস্টারমশাই-এর হাতের লিক্‌লিকে বেতগাছটা যেটা নিশ্চয়ই এখানে পালিশ করা হয়। ওদেশে গিয়ে দেখলাম এই আইন-মানার দেশে ও জিনিসটার অস্তিত্বই লোকে ভুলে গিয়েছে। বেতটা "অস্তি" নয়, ওটা 'আসীৎ'। এমন কি পাছে মাস্টারমশাইরা বেতের বদলে রুলকাটি বা বই খাতা দিয়ে কাজ সারেন তার জন্য সে ভারগুলো দেওয়া হয়েছে দিদিমণিদের হাতে। সেদেশে 'তোমার ব্যবহার যথেষ্ট ভদ্রোচিত নয়' বলার বাড়া গাল নেই। সেখানে বাবা মা ছোট ছেলের হাত থেকে জিনিসটি তুলে নিয়ে বলেন, 'বল, Please may I have it back।' দিয়ে বলেন, 'বল, Thank you'

সেদেশে পুলিশ কমিশনার সিনেমার মারফতে আবেদন জানান জনসাধারণের কাছে—'কোথাও যদি শিশুর উপর অত্যাচার করা হয় আমাদের কাছে জানান।' বাবা-মা যদি শিশুকে রীতিমত খাওয়া দিতে না পারেন তার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হলে সামান্য কিছু সাহায্যেরও ব্যবস্থা হয়। শিশুর রীতিমত যত্ন না হলে প্রতিবেশীরা আপত্তি জানায়। সন্তানসম্ভবা মায়ের জন্য সস্তাদরে জিনিসপত্র কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। ডাইভোর্স করার সময় পিতা শিশুকে কাছে পাবার জন্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন—মা রীতিমত শিশুর যত্ন করছেন না।

এই যে 'শিব ঠাকুরের আপন দেশ' এখানে শিশুর উপর শাসনের নামে অত্যাচার যদি না উঠে যেত, ওদের চোখেমুখে দেখা যেত কি অমনি খুশীর প্রাবল্য? নূতন আগন্তুকের সংগে কথা বলার সময় তারা কি দিয়ে ঢাকত তাদের অসহায়ত্বের ছবি? শিক্ষকতার ট্রেনিং নিতে গিয়ে একদিনও কি চোখে পড়ত না ছাত্র-মাস্টারের সম্পর্কটা? আমাদের কোন ছাত্র কি বলতে পারবে একটি আমেরিকান্ তরুণীর চুলে হাত দিয়ে, 'তুমি ওরকম করে চুল বেঁধেছ কেন?' ছাত্র-মাস্টারের সম্পর্ক এমন মধুর বলেই সেদেশে শিশুরা বেড়ে ওঠে বন্যবৃক্ষের মত আপন খেয়ালখুশীতে। তাই সেদেশের বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন শিশুকে আরও স্বাধীনতা, আরও সুযোগ দিতে। তারই সার্থক পরিণতি পাই Froeble, Montessory আর Pestalozzi শিক্ষা-পদ্ধতিতে, আর তাই বিলাতের ছেলেমেয়েদের স্কুলগুলো আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। এ সব স্কুলের কথা যত ভাবি তত মনে হয়—আমার ইংল্যাণ্ডে আসা সার্থক হয়েছে।

ইংরেজ চাষী-পরিবার

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দেখার ইচ্ছাটা ছিল বরাবর। কিন্তু ছাত্র হিসাবে ইংল্যাণ্ডে বাস করলে অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ দেখতে যাওয়া একটু কষ্টকর বই কি। কারণ সব স্কুলকলেজ একই নিয়ম ধরে চলে আর প্রায় একই সময়ে খোলে আর বন্ধ হয়। একদিন, দেশে ফেরার সময় যখন এগিয়ে এল, ক্লাশের একটি আধুনিক মতাবলম্বী মেয়ে আমায় বলল, 'তুমি আমাদের বাড়ী এস, আমরা কেম্ব্রিজ থেকে ৪০ মাইল দূরে থাকি। আমার গাড়ী করে তোমাকে কেম্ব্রিজ দেখিয়ে আনব। অবশ্য দেখবে খালি দালান আর কোঠা, চার্চ আর বাগান।' বললাম, 'তা'ই সই'।

কৌতূহলটা আরও একটা কারণে বেড়ে যাচ্ছিল—ইংরাজ পরিবারে এরকম মেয়ে কি করে জন্মায়। শুনেছি ওর বাবা কৃষক। এই উপলক্ষে ইংরেজ চাষীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করাও সম্ভব হবে। ওর সংগে আলোচনায় জানলাম, বাবা প্রাচীনপন্থী আর মা আধুনিকতার পক্ষপাতী। মা আর মেয়ে চেয়েছিলেন লেবার গভর্ণমেণ্ট, আর বাবা চার্চিলের ভক্ত। মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, তবে কখনও সেটা মারাত্মক হয় নি। সবারই খানিকটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।

এসেক্সের এই ছোট গ্রামটির স্টেশনে যখন গাড়ী থেকে নামলাম একটু সংশয় আর শংকায় ভাবছিলাম, যদি বান্ধবী স্টেশনে না আসে পরের কর্তব্য কি? এমন সময় জড়িয়ে ধরল এসে এলিজাবেথ। সংক্ষেপে তাকে আমরা ডাকতাম 'বেথ' কখনও বা 'our queen' বলে। ও বলল, 'চল কি মজাই না হবে! জান আমাদের বাড়ীতে নানা দেশ থেকে অতিথি আসে; কিন্তু ভারতীয় আসে নি কখনও।'

বয়স এই মেয়েটির উনিশ কুড়ি হবে। অফুরন্ত উৎসাহ তার সব কিছুতে আর ছোট শিশুর মত জিজ্ঞাসা। গাড়ী চালাতে চালাতে দু'পাশের ক্ষেতগুলো দেখিয়ে বললে, 'তোমাদের দেশে এমন সুন্দর ফসল আছে?'

হেসে বললাম, 'না তা কি আর আছে? তোমরা পাঠালে তবে আমরা খেতে পাই।'

হেসে বললে, 'তোমরা যে শুনেছি বলদ দিয়ে চাষ কর।'

'তা করি বই কি? আমাদের ত আর তোমাদের মত পাহাড়ী দ্বীপের মত মাটি নয় যে শরতে বীজ বুনলে সারা শীত ঘুমিয়ে থেকে বসন্তে চারা বার হবে। সহজেই আমরা ফসল পাই বলে আমাদের গরীব দেশে ট্র্যাকটারের অভাব অনুভব করলেও সুন্দর ফসল ফলাতে কসুর করে না চাষীরা—যদিও তা তাদের ভাগে জোটে না বেশী।'

নানা দেশের চাষের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে ওদের বাড়ীর দরজায় এলাম। অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে এলেন ওর মা মিসেস গাওলেট। ছোটখাট ছিমছাম মানুষটি। বললেন, 'এস, এস, আমরা সবাই তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছি।' তাকালাম চাষী-গৃহিণীর দিকে, প্রাচুর্য আর শিক্ষা কোনটারই দেখছি অভাব নেই। বাইরের বাগানে মুরগীর বাচ্চা পালবার জন্য বড় কাঠের ঘর, তারপর সুন্দর যুঁইলতা এঁকে বেঁকে উঠে তৈরী করেছে কুঞ্জ। তারই আড়ালে ছোট দোতলা বাংলোখানি। স্বয়ংসম্পূর্ণ ইলেকট্রিক বা গ্যাস এই দূর গ্রামের ছোট বাড়ীটিতে পাওয়া যায় নি, কিন্তু রান্নাঘর কয়লার ধোঁয়া ময়লায় আচ্ছন্ন নয়। এমন সুন্দর করে উনুন আর জলগরমের ব্যবস্থা যাতে রান্নাঘরে ড্রয়িংরুমের কাজও চলে যায়। শহরের থেকে

গ্রামের রান্নাঘরটির তফাৎ এই—এটা অনেক বড়, আর এই রান্নাঘরে আছে প্রচুর খাবার জিনিস।

কৃষক ভদ্রলোকের দেড়শ গরু আর পাঁচশ মুরগী। কাজেই মাখন, সর আর ডিম খেয়ে প্রায় একবছরের মত ওসবের অভাব আমরা পুরণ করে নিলাম। বাড়ীর দু'পাশে গোলাপ ফুলের বন, আর তাতে নানা-রকম সুগন্ধ, নির্গন্ধ, পাঁচপাঁপড়ি, শতপাঁপড়ি, লতানো আর ঝোপওয়ালা গোলাপের সমারোহ। ডানদিকে তরকারী বাগান, আর তারই এক কোণে দুটি মৌমাছির চাক—শুনলাম এরা পোষা। বাড়ীর পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা। বেথ বলল, 'এটা আমরা কেটে কুটে টেনিস কোর্ট করব। তবে আমাদের তেমন সংগী সাথী নেই কিনা, তাই আমরা তেমন গা করি না। চল ওদিকটায় দেখবে।' বাড়ীর উত্তর দিকটায় আস্তাবল, ট্রাক্টার-গ্যারেজ, শস্যের (গমের) মড়াই, বড় মুরগীদের থাকবার ঘর, চরবার ক্ষেত, আর তার বাকী সবটা জুড়ে যে দিকে দুচোখ যায় শস্যক্ষেত।

ভদ্রলোকের পাঁচশ বিঘা জমি, দুটো ট্রাক্টার আর পাঁচটা ঘোড়া। খেতের কাজে সাহায্য করেন মাঝে মাঝে তাঁর মেয়ে আর স্ত্রী, না হলে একাই করেন সব কিছু। একটা ট্রাক্টার দিয়ে আগাছা কেটে আর একটা দিয়ে মাটি খোঁড়া, বীজবোনা, ফসলকাটা সবই হয়। দুধ আর ডিম নিজের প্রয়োজনের মত রেখে সবটাই বিক্রী করে দেন সরকারের কাছে। ফসল পুরোটাই বিক্রী করে দেন এবং প্রয়োজনমত রেশন নিয়ে আসেন। সরকারের উপর আছে পরিপুর্ণ আস্থা। আর ইংল্যাণ্ডের রেশনিং ব্যবস্থার অভূতপুর্ব সাফল্য এবং দালাল নামটির অপরিচিতিতে দাম এবং খাদ্য কোনটারই অপ্রাচুর্য ঘটে না। শহরের সংগে যোগাযোগ রাখা হয় টেলিফোন আর গাড়ী

মারফৎ। মেয়েরা বোর্ডিংএ থেকে পড়াশোনা করে। খাওয়া, থাকা আর পড়াশোনা সবটাই চলে নির্বিবাদে। তাই যখন জিজ্ঞাসা করলাম ভদ্রমহিলাকে, 'আচ্ছা, তোমাদের অবর্তমানে এই বিরাট সম্পত্তির কে মালিক হবে? তোমাদের দেশে ত চাষের জমি ভাগ হয় না, কি করবে? মেয়েদের বিয়ে হ'লে তোমার জমি দেখা শোনা করবে কে?' উত্তরে শুন্‌লাম তাঁদের কৃষিব্যবস্থার কথা।

'আমার মেয়েদের মধ্যে কারোরই চাষের উপর খুব ঝোঁক নেই। তবে যে চাইবে থাকতে তাকেই জমিটা দেব আর এই বাড়ীটা। আর একজনকে এই সম্পত্তির অর্ধেক দাম ধরে দেবে সে, তা সে কিস্তিতেই হোক আর একবারেই হোক। আর যদি দু' মেয়েই এদিকে ঝোঁক দেয়, তাহলে এই জমির একপাশে আর একটা এরকম বাড়ী তৈরি করে ওরাও থাকবে, এক সংগে জমির কাজ করবে, ফসলের টাকাটা ভাগ করে নিয়ে নেবে।'

'আর যদি কেউই না চায়?'

'সে দুর্দিন যদি আসেই তবে জমি (বাড়ীসহ) বিক্রী করে দামটা দুজনে ভাগ করে নিয়ে নেবে। আমরাও ত এই জমিটা কিনেই নিয়েছি। যদিও আমাদের কষ্ট হবে, ওদের সুবিধাটাও ত দেখতে হবে।'

আমি বললাম, 'চাষের জমি ভাগ হয় না বলেই এখনও গাড়ী বাড়ী ক্ষেত খামার নিয়ে সগৌরবে বাস করছ, না হলে জানিনা কি হত। তোমার স্বামী পরিবারের ছোটছেলে, তাই নির্বিবাদে বাপের সম্পত্তি ছেড়ে চলে এল। মামলা আর ভাগ বাঁটোয়ারার সমস্যা নিয়ে চুল পাকাতে হয় নি। আর মেয়েরাও সুস্থ সবল মন নিয়ে বেড়ে উঠতে পেরেছে। তোমরা এগিয়ে চল, আর আমরা চেয়ে তোমাদের দেখি।'

দুয়েকটা ইংরেজ পরিবারে আতিথ্য নিয়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল—জীবন এঁদের বড় আঁটসাঁট। প্রতিটি মুহূর্ত কাজ দিয়ে ভরে রাখার চেষ্টায় ব্যাকুল। অবশ্য এদের আবহাওয়াটাও এর পক্ষে বেশ অনুকূল। সকাল বেলা উঠে পোষাক পরিচ্ছদ যা পরা হয় তা সারাদিন ব্যবহার করতে হয়। রাতে আবার ঘুমোবার সময় তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সারাদিন কাজ করতে হয় কিংবা তা নাহলেও একটু আরাম করে শুয়ে থাকা বা একবার বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়াটা একেবারে আইনবিরুদ্ধ। বেড্‌রুমের সংগে সম্বন্ধ একেবারে দিনান্তে একবার। তাই সারা সপ্তাহে একই পোষাকে একটুও ভাঁজ না ফেলে কাজ চালিয়ে দেওয়া যায়। অতিথি এলে সারাদিন তাকে কি করে ব্যস্ত রাখবে সেই চিন্তায় এরা আগে থেকেই তৈরী করে রাখে সারাদিনের রুটিন। কেউ না কেউ অতিথির কাছে বসে কথা বলা, ও অন্যরকমে তাকে সঙ্গ-দান করাটাই নিয়ম। তার জন্য সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকে। এবারে আমার জন্য ব্যবস্থা ছিল Quaker Schoolএর শতবার্ষিকী উৎসবে উপস্থিতি, আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনলাভ।

খ্রীস্টানদের অনেকেই এই Quaker আন্দোলনের সংগে জড়িত। তাদেরই চেষ্টায় গড়ে উঠে আজ এখানকার এই স্কুলটির পূর্ণ যৌবন। খেলার মাঠ, সুইমিং পুল, বোর্ডিং (ছেলে মেয়ে উভয়ের), এক্‌জিবিশন হল, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী সব মিলিয়ে দেখেছি—এ এক বিরাট ব্যাপার। স্কুলের অধ্যক্ষ ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং দেখাতে গিয়ে বললেন, 'রাত আটটার পর ছেলেমেয়েদের অন্যের আবাসে যাবার নিয়ম নেই। তবে 'Dont be surprised if you see a girl coming out of the boy's boarding at 10 O' clock at

night or vice versa !' আমরা ভদ্রলোকের প্রাণখোলা হাস্তে যোগ দিলাম। নিজেদের স্কুলের ইতিহাস নিয়ে ছেলেমেয়েদের অভিনয় ভারী ভাল লাগলো। এই একশো বছরের ইতিহাস চোখের সামনে দেখে ধারণা হোল স্কুলটি সম্বন্ধে, কত বাধাবিঘ্ন আর বিধিনিষেধের বিপদ এড়িয়ে এরা আজ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। সবাইকে ধন্তবাদ দিয়ে আবার গাড়ীতে উঠে বসলাম। বেথ এবার এক খরগোসের পিছন ধাওয়া করল তার গাড়ী নিয়ে। অবশ্য ধরবার তেমন চেষ্টা করল না।

পরের দিন রওয়ানা হলাম কেম্ব্রিজ। সকাল বেলাই কিছু খাবার সংগে করে নিয়েছিলাম। দালান, বাড়ী আর কলেজ ঘুরে দেখতে দেখতে বেজায় ক্ষিধে পেয়ে গেল। সত্যিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন, কলেজ আর গীর্জার সংখ্যা দেখে অনুমান করা যায় না। কিংস কলেজ, কুইনস কলেজ, কিংস চ্যাপেল, কুইন্‌স্‌ চ্যাপেল—এই চারটিই বিশেষ আকর্ষণীয়। গীর্জাগুলো দেখতে অসুবিধা হোলনা মোটেই। খ্রীস্টানদের যেখানেই যত কলেজ স্কুল, তার সংগে আছে গীর্জা। অন্য কোন ধর্মেই বোধ হয় এমনি করে ছেলেমেয়েদের কচি মাথায় বেশ করে ধর্মমত ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা এ যুগে আর নেই। আর বোধ হয় সেজন্যই এত সংঘবদ্ধতাও নেই আর কোথাও।

স্কুল, কলেজ, গীর্জা, পোস্টাফিস আর দোকান বাজার মিলিয়ে এই শহর কেম্ব্রিজসায়ার। ইউনিভার্সিটির ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে ছোট খাল কেম্ব্রিজ নদী। নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা চারজন বেথ, মিসেস গাওলেট, ফরাসী মেয়ে মার্টিন আর আমি যখন নৌকা ভাড়া করলাম কেউই ভাবিনি যে আমরা এত আনাড়ি। বৈঠা হাতে নিয়ে সবাই চুপচাপ বসে আছি। মার্টিন জাতিতে সুইস-

ফ্রেঞ্চ, বছর ১৬ বয়স। একটি ফরাসী-ইংলিশ ডিক্সনারী সম্বল করে বেথদের পরিবারে এসেছে গরমের ছুটিতে ইংরেজী শিখতে। হেসে সে গড়িয়ে পড়ছে। পূর্ববঙ্গের স্মৃতি জেগে উঠল আমার মনে। বাঙাল মেয়ে না, নৌকাও বাইতে পারব না? প্রাণপণ চেষ্টায় বৈঠায় টান দিলাম। নৌকা ভেসে চলল, সাহায্য করল অপর তিনজন। পাড়ে লাগিয়ে একবার খেয়ে নিলাম। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল আমাদের মত আরও দল। যারা পিকনিক করতে এসেছে কেম্ব্রিজের খালের পাড়ে, তার মধ্যে ভারতীয়ও আছে কিছু। শোনা যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এত ভারতীয় ছাত্রছাত্রী পড়ত যে, আলাদা ভারতীয় খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। অবশ্য এখনো আছে ক্যালকাটা রেস্টুরেন্ট, তাতে কুলায় নি। এখন অবশ্য সবাই ছুটি কাটাতে বাইরে গিয়েছে।

যথা সময়ে নৌকাটি জমা দিয়ে আমরা ফিরে এলাম। ফেরার পথে রাস্তা হারিয়ে ফেলায় আরও খানিকটা ঘুরে বাড়ী ফিরলাম। তখন বেশ রাত হয়েছে। পরের দিন সকাল বেলা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম লণ্ডন। দু'দিনের স্মৃতি মনে হয়ে রইল গাঁথা। ইংরাজ পরিবারেও যে ভারতীয় আতিথেয়তার নিদর্শন মেলে তার প্রমাণ এই ছোট পরিবারটি। আর একটা কথা বুঝ্লাম—চাষী বল্লেই যে এদেশে দরিদ্র, দুর্দশাগ্রস্ত, নিরুপায় মানুষ আমরা ভাবি, তা ভাব্বার কারণ নেই—অবশ্য যদি কৃষক পান যথেষ্ট জমি, যথেষ্ট সাহায্য, যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা।

আয়ার্ল্যাণ্ড—শাদাচোখে

ইউরোপ যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম পাশের টেবিলে একটি আইরিশ মেয়ে একটি নবাগতা ইরাণীকে বলছে হাসতে হাসতে, 'ইংরাজরা আমাদের দেশ দখল করতে এসেছিল, আমরা ওদের লাথি মেরে বিদায় করেছি। (we kicked them out)।' সজাগ হয়ে উঠ্‌ল কান আর মন। আয়ার্ল্যাণ্ডের সিনফিন আন্দোলন—বাংলার অগ্নিযুগ যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিণতি—স্বাধীন আয়ার আর স্বাধীন ভারতে—সেই মুক্তি যোদ্ধাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেলাম ঐ স্বাধীন আইরিশ তরুণীর কণ্ঠস্বরে। খাবার টেবিল থেকে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার দেশের কথা একটু বলো ত শুনি!' আরও দুটি আইরিশ তরুণী আমাদের হোস্টেলের বাসিন্দা ছিল, তিনজনে মিলে বলল, 'এস আমাদের ঘরে, বলছি।'

আমাদের বোর্ডিংয়ের তিনতলার দক্ষিণ-পূর্বকোণে আমার নিবাস—'ইণ্ডিয়া হাউস', আর দোতলার উত্তর-পশ্চিমকোণে ওদের আবাস—'আয়ার'; মাঝখানটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি আমাদের প্রাক্তন প্রভু অর্থাৎ England ও Scotland-কে; আর মিত্রশক্তিরা অর্থাৎ ইরান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, আমেরিকা, বারমুডা, জামাইকা এরা বাস করে এপাশে ওপাশে। পুরাদস্তুর আন্তর্জাতিক উপনিবেশ গড়ে তুলেছি আমরা এখানে।

এই 'আয়ার'-এর রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী ময়রা যখন শুনল কি আমি দেখতে চাই, শুনতে চাই, এক এক করে বলে গেল স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাস। বলল, 'আমরা তখনও জন্মাইনি, আমার বাবা তখন কেবলমাত্র স্কুলের ছাত্র, মায়ের মুখে শোনা সে কাহিনী, যদি শোন অনভ্যস্ত কান তোমার শিউরে উঠবে। যেদিন ও'কনেল স্ট্রীটের উপর গর্ভবতী নারীকে গুলি করে মারে হিংস্র ইংরাজ সেনানী, সেদিনই ব্যাংক অব আয়ার্ল্যাণ্ডের নীচের তলায় বসে স্বাধীন আয়ার-এর প্রথম গঠনতন্ত্র রচনা করেন আমাদের প্রিয় ড্যাভ্ (De Valera) আর তাঁর সহকর্মীরা। উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ড আমাদের সংগে এখনো যোগ দেয়নি, ওরা বিশ্বাসঘাতক ; তার মজাটা এবার বুঝছে। আমি ত সব কথা তোমায় বোঝাতে পারব না এস তুমি আমাদের দেশে, আমার বাবা মা আর বন্ধুদের কাছ থেকে সব শুনবে।'

এক শীতের সন্ধ্যায় যাত্রা করলাম অজানার সন্ধানে। চিরকালই যে পথিককে দিয়ে এসেছে অহেতুক উষ্ণতা সেই 'আইরিশ সমুদ্র' আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম করল না। সাগরবেলায় যখন অবতরণ করলাম, নবোদিত সূর্যের রক্তিম রাগের সংগে আমাকে আহ্বান করলেন আমার নিমন্ত্রণকারিদ্বয়, ময়রা আর তাঁর পিতা। সাগ্রহে তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে এসে উপস্থিত হলাম 'গ্লেনগেয়ারী' গ্রামে অবস্থিত তাদের ছোট্ট বাংলো-টাইপের বাড়ীটিতে। গোটা পরিবারটি আমাকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানাল চায়ের টেবিলে। ভারতের বর্তমান-অতীত আর ভবিষ্যৎই ছিল আলোচ্য। ভারতীয় শাড়ী আর 'কারি'র প্রতি বিদেশীর চিরন্তন পক্ষপাতিত্বের এখানেও কোন ব্যতিক্রম হল না। কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বললাম, 'আর আমি যে এলাম ভারতীয় নারী তার বুঝি কোন কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।'

চায়ের পেয়ালাটা ঠক করে নামিয়ে হেসে বললেন মিসেস্ পিগট্, 'তাইত, কথাটা একেবারেই মনে হয়নি। তুমি আবার কি বলবে ?

অতিথি মানুষ, খাবে-দাবে সপ্তাহ শেষে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে আর ধন্যবাদ দিয়ে সেখান থেকে চিঠি দেবে, এই না নিয়ম।'

'তা, সে নিয়মটাও ত বলে দিতে হয়। না হলে বিদেশী অতিথি কোনখানে যে মাত্রা হারিয়ে ফেলবে তার ঠিক কি? কোন্ কথাটা যে তোমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়বে না, আর কোনটা তোমাদের বিরক্তির উদ্রেক করবে না, তার হদিশ একটা দিয়ে দাও না? মিলিয়ে দেখি এই ক'মাস ধরে যা শিখছি তার সংগে মিল খুঁজে পাই কিনা।'

তুমুল প্রতিবাদ উঠল প্রতিটি চেয়ার থেকে, 'সে চেষ্টা কোরোনা। তোমার ইংরেজদের সংগে আমাদের কোথাও মিল নেই—এক ভাষা ছাড়া। মাত্রা সম্বন্ধে তুমি যেটা ভাববে সেটাই প্রকৃষ্ট নির্দেশ। তুমি ইচ্ছা করলে জোরে হাসতে পর্যন্ত পারবে।'

আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'জান কি তোমাদের সিন্‌ফিন্ দল আর তোমাদের হোমরুল আন্দোলনই আমাদের বিপ্লবীদের জুগিয়েছিল প্রেরণা। তোমাদের সাফল্যই উৎসাহিত করেছিল অন্ততঃ বাংলার অগ্নিযুগের শহীদদের, আর তাই তোমাদের সেই বিপ্লবীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানবার জন্য আমার এত আগ্রহ।'

বলল ময়রার বোন ক্লডা, 'চল, তা হলে আমরা মিউজিয়ম দেখতে যাই; সেখানে সবই রাখা হয়েছে সযত্নে। যাদের রক্তের বদলে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা তাদের আমরা ভুলিনি।'

গিয়ে দেখলাম—মুক্তির মূল্য সবদেশকেই একই রূপে দিতে হয়েছে। দেশের আয়তন অনুপাতে যোদ্ধার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে, গুণের তারতম্য হয় না। যাদের আবেগ আর দান যত তীব্র, তাদের শাপমোচনও হয়েছে তত তাড়াতাড়ি। অবশ্য

দেশের আর পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থাও কিছুটা পরিমাণে দায়ী তার জন্য, সন্দেহ নাই। ১৩ বছরের কিশোর থেকে আরম্ভ করে ৬৩ বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই যোগ দিয়েছে সেই মুক্তিযুদ্ধে। আর আমাদের চিরপরিচিত জেল, নির্যাতন, গুলি, গোপন সমিতি—দলাদলি, রক্তপাত, দুই দলের রেষারেষি, কিছুরই অভাব হয় নি। ডাবলিন জি, পি, ও, থেকেই বিপ্লবীরা চালিয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ—তাই এই জি, পি, ও, বুকে ধারণ করে রেখেছে জাতীয়নেতা 'কুহুলানের' প্রস্তর মূর্তি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কুহুলান আয়ার্ল্যাণ্ডের রূপক, আর বড় রাস্তার উপর ও' কনেল মূর্তি—বিপ্লবের স্মারক। এর গায়ে আছে বুলেটের চিহ্ন। আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীরা এই চিহ্নগুলিকে দেখায় শ্রদ্ধার সংগে আর গর্ব অনুভব করে নিজের দেশের দিকে চেয়ে।

বিদেশীর চোখে এসব দেখার পরে মনে হবে—'ততঃ কিম্?' এই যে আত্মদান, এই রক্তপাত এ ত সার্থক—স্বাধীনতা ত লাভ হয়েছে। তা না লাভ হলে আয়ার্ল্যাণ্ড মিথ্যাই হত। কিন্তু সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হতে হলে চাই দেশের সাধারণ মানুষেরও মুক্তি। বিদেশী শাসন আর আয়ার্ল্যাণ্ডে নেই সত্যি, কিন্তু রাস্তায় ছেঁড়া কাপড পরা ভিখারীর দল, বিদেশে কর্মপ্রার্থী আইরিশ যুবকের ভীড়, ইনফ্লেশনের চাপে হিমসিম খেয়ে যাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবার, জীবনধারণের উপায় সংগ্রহে অক্ষম বেকার যুবকযুবতী, আর অনশনক্লিষ্ট বৃদ্ধবৃদ্ধার শহরে জমান ভীড়, এসব যে মনে করিয়ে দেয় আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা এখনো সর্বাঙ্গীণ হয় নি। আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ আর্থিক স্বরাজ পায়নি—মনের স্বরাজ পেয়েছে কিনা কে জানে। তা না পেলে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের আত্মদানও সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেছে বলব কি করে? তাই যখন ট্রিনিটি কলেজের

অধ্যাপকের সংগে আলাপ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, তোমাদের দেশ দেখতে ত বেশ সুন্দর ; আর উপর থেকে দেখে কিছু বোঝারও ত উপায় নেই। তবে তোমাদের এখন সব থেকে বড় সমস্যা কি—কিছু বলতে পার?' ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'সমস্যা কি একটা যে তোমাকে বলব? ক'টার কথা শুনতে চাও? অর্থনৈতিক, সামাজিক, কোন অধিকারই ত বলতে গেলে আমাদের হাতে আসে নি। একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা হয়েছিল ১৯১৮ সালে। সে ক্ষমতাও সঞ্চিত হয়েছে ধনিক আর উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের হাতে। দারিদ্র্যে, অস্বাস্থ্যে, অনাহারে জাতির সাধারণ মানুষ আজ প্রায় ধ্বংসের মুখে। অথচ বাইরে দেখলে কিছুই বুঝবে না।'

বললাম, 'আমার Host ত বলেন তোমাদের টাকা নেই বলে দেশের উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছে না। আচ্ছা, তোমাদের আয় বাড়াবার কোন পথ কি তোমরা বার করতে পার না?'

'আর বল কেন? সে চেষ্টায় আজ ৩০ বৎসর ধরে আমরা মাথা খুঁড়ে মরছি—বোধ হয় পাথরের দেয়ালে ; তাই নিজের মাথারই রক্তপাত হচ্ছে মাত্র। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ১৭।১৮ বৎসর বয়স হতেই চলে যায় ইংল্যাণ্ড চাকরী করার জন্য। অথচ এদেরই জন্য প্রায় চারশো বৎসর আগে আমরা যে আইরিশ ভাষা ব্যবহার করতাম তার পুনঃ প্রচলনের চেষ্টার সীমা নাই। মাতৃভাষা পুনরুদ্ধার খুব ভাল জিনিস সন্দেহ নাই, কিন্তু তার কার্যকরী দিকটাও ত দেখতে হবে? কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই ত জীবন কাটায় ইংল্যাণ্ডে। এমন কি নর্দার্ন আয়ার্ল্যাণ্ডে (তা ইংলণ্ডের সঙ্গেই যুক্ত, আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়)-ও আমাদের ভাষা চলে না—কি হবে বলত অনর্থক সময় এ ভাষার পিছনে নষ্ট করে?'

'তোমাদের ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক পড়া শেষ করে ছেলেমেয়েরা কি করে?'

'দেশ আমাদের রোম্যান ক্যাথলিক। গোঁড়ামি তোমাদের হিন্দু-ধর্মের চেয়েও বেশী। পরিবার সংকোচনকে আমরা মনে করি পাপ। ওদিকে যে হারে পরিবারের জনসংখ্যা বেড়ে চলে সে হারে আয় না বাড়াতে স্কুল কলেজে কোনরকম অক্ষর পরিচয়ের পরই ছেলেমেয়েরা পথ দেখে উপার্জনের। আর সে স্কুলই বা কিরকম? ধর্মের আশ্রয়ে পরিবারের শান্তি আর মাধুর্য আমরা অটুট রাখব সেই যুক্তিতে দুপুরের ছুটিতে স্কুলে লাঞ্চ দেবার ব্যবস্থা করা হয় না। লাঞ্চ দিলে পরিবারের শান্তি নষ্ট হবে। (ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব স্কুলেই মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা থাকে)। দারুণ শীতে খালি পায়ে আর প্রায় খালি গায় গরীব ছেলেমেয়েগুলি 'পারিবারিক সম্পর্ক' বজায় রাখার জন্য বেলা ১২টার সময় হয়ত ১।২ মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ী যায় লাঞ্চ খেতে। খায় কি, সেকথা আর নাই বা বললাম। বাস করে একটা ঘরের মধ্যে কোনরকমে মাথা গুঁজে গোটা পরিবার। সে বাড়ীগুলো আবার মিউনিসিপ্যালিটির condemned house. প্রত্যেক বছরই ফিন্যান্স বিল পাশ হবার সময় শোনা যায়—টাকার অভাব, এবার বেশী বাড়ী তৈরী করা যাবে না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'শুনেছি Industrialisation-এ দেশের অবস্থা সমৃদ্ধ হয়। তোমাদের যখন এতই দুরবস্থা তোমরা ত তা করলে পার। তা হলে তোমাদের ত ছোট্ট দেশ (প্রাক্‌যুদ্ধযুগের) জাপানের মত সমৃদ্ধিশালী হতে পারে। দেশের ছেলেমেয়েদের আর বিদেশের রাজারাণীর হয়ে যুদ্ধ করতে হয় না।'

ব্যংগের সুরে বলে চললেন অধ্যাপক, 'সে হবার যো আছে

নাকি? তাহলে ধর্মের ঝুলিতে টান পড়বে না?, পাদরীদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে না শিল্পওয়ালাদের হাতে? যারা গদীতে বসে আছেন রক্ষণশীলতার দোহাই না দিলে নূতন লোককে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। সে নূতন লোক অন্তত ধর্মে রোম্যান ক্যাথলিক না হলে তার কথা ক'জনা শুনবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। চোখে আমাদের ঠুলি, হাতপায়ে আমাদের শিকল। ধর্মের নামে এমন সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচার বোধ হয় তোমাদের হিন্দুধর্মেও নেই।'

হয় ত মিথ্যা নয়। কারণ হিন্দুধর্ম এমন চার্চ তৈরী করতে পারে নি, এমন ঠুলি বানানোর কৌশল, এমন শিকল বানাবার যন্ত্রও তার আয়ত্তে নেই। এই ক্যাথলিক কাঠামোর মধ্যে এর বেশী যুক্তি ও চেতনালাভ কোনো দেশের বড় বেশি সম্ভব হয় না। হয়ত ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ইতালি ও ফ্রান্সের পিছিয়ে থাকারও একটা কারণ তাই। তবু এই কাঠামোর মধ্যেও আয়ার্ল্যাণ্ডে যা একটু চেষ্টা হচ্ছে, তার দৃষ্টান্তও দেখলাম।

ডাবলিনের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ল একটা ক্লাব—নাম তার মাউণ্টজয় ক্লাব। মিসেস্ বেরীর সংগে পরিচয় হয়েছিল আগেই। ভদ্রমহিলার স্বামী পাগল, বাস করেন আলাদা। কিন্তু রোম্যান-ক্যাথলিক ধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদ না থাকায় ভদ্রমহিলা আবার বিবাহ করতে পারেন নি। এই ক্লাবটির তিনি সেক্রেটারী, সাদরে আহ্বান করলেন আমাদের। ভিতরে গিয়ে দেখলাম কিছু পরিমাণে সমাজ সেবার ব্যবস্থা করছেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা। রাস্তা থেকে বেকার লোকদের ধরে এনে এই ক্লাবের মেম্বার করা হয়। সারাদিন কাজ করিয়ে কাজের বদলে দেওয়া হয় "ট্যালি" অর্থাৎ একরকম টিকিট। কাজের ইউনিট অনুযায়ী খাওয়া, পোষাক আর ফার্নিচার বিতরণ করা

হয় ঐ 'ট্যালি'র বিনিময়ে—পয়সার কোন কারবার সেখানে নেই। মেম্বাররাই কেউ রান্না করেন, কেউ ফার্নিচার সারান, কেউ বাগানে তরিতরকারী ফলান; আর ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা চেষ্টা করেন ওদের অন্যত্র কাজ জুটিয়ে দেবার। আমাদের employment exchange-এর মত। নিজের চেষ্টাতেই হোক আর পরের চেষ্টাতেই হোক কাজ পেলেই এখানকার মেম্বারসিপ কাটা যায়। অবশ্য কাজটি গেলে পর আবার মেম্বার হওয়া মোটেই কষ্টকর নয়। এখানে যেমন আছে অনেক রকম কাজ, কাজ করার ব্যবস্থা, তেমনি আছে রাজ্যের যত ছেঁড়া জিনিসপত্র সারাই করার ব্যবস্থাও। যেগুলো ভদ্র নাগরিকরা আর ব্যবহার করতে পারেন না, এনে জমা দেন এখানে; আর মেম্বাররা তা সারিয়ে 'ট্যালি'র বদলে কিনে নেন। উপযুক্ত রকম টাকা-পয়সার অভাবে এই চমৎকার শ্রমবিনিময়কেন্দ্রটি ভালভাবে চলতে পারছে না। একমাত্র দানের উপর নির্ভর করে কোন জিনিসই চলতে পারে না, তা সে যতই কেন ভাল হোক্।

শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়ের জন্য যে স্কুল আছে (সংখ্যায় তা মুষ্টিমেয়) তার সন্ধান নিতে গিয়ে যা শুনলাম, তাও খুব আশাপ্রদ মনে হোল না। "সিভিক্ ইনষ্টিটিউট অব আয়ার্ল্যাণ্ড" এদের সহায়তা করার জন্য কয়েকটি নার্সারি কেন্দ্র খুলেছেন, ২—৫ বছরের শিশুদের জন্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিশুদের এখানে রাখা হয় যতদিন মায়ের চাকরী থাকে। চাকরী যদি যায়, অথবা মায়ের কোলে যদি আবার একটি পোষ্য-সংখ্যা আবির্ভাবের দরুণ মা বাড়ী বসে থাকতে বাধ্য হন—তা হলে নার্সারী স্কুল কর্তৃপক্ষ সে মায়ের সন্তানকে বাড়ী পৌঁছে দেন। কারখানা কর্তৃপক্ষের সই করা একটি পরিচয়-পত্রের সহায়তাতেই কেবলমাত্র এখানে ছেলেমেয়ে ভর্তির অনুমতি পাওয়া

যায়। বেকার মায়েদের সন্তানের কোন ব্যবস্থা নেই—স্থান এবং অর্থাভাব।

সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ছেড়ে দেখতে গেলাম বিশ্ববিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজ। কলেজের সবচেয়ে পুরনো বাড়ীটি কিন্তু কলেজের চেয়েও ১৫০ বৎসরের ছোট। সুন্দর লাল বাড়ীটি, জন্ম এর ১৫৯১ সালে, ব্যবহৃত হয় আজকাল কলেজের ছাত্রাবাস হিসাবে। এখানকার লাইব্রেরীটি ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎ লাইব্রেরীর অন্যতম। অর্ধলক্ষ বই-এ সাজান হলঘরটি একমাত্র ভার্সাইপ্রাসাদের হলঘরটির থেকে নাকি লম্বায় ছোট। Kells নামে একখানা বই সযত্নে কাঁচের আধারে সাজান আছে, কারুকার্য অপূর্ব। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে—যখন নাকি ইউরোপে সভ্যতার চিহ্নও পাওয়া যায় না—রোম্যান ক্যাথলিক পাদরীরা এই রংগীন ছবির সাহায্যেই বাইবেলের অধ্যায়গুলি জীইয়ে রাখত। কতগুলো প্যাটার্ন বা নক্সা মনে হোল প্রাচ্যদেশীয়। আর্যরা যে প্রাচ্যদেশ থেকে পশ্চিমদিকে যাত্রা করার সময় প্রাচীনতম প্রাচ্য শিল্প-কলাও সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তারই প্রমাণ হয়ত। রংগুলি আজ পর্যন্ত ম্লান হয়নি। এর অনুকরণ হয়েছে, কিন্তু একে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি কেউ।

ট্রিনিটি কলেজ বাঁচিয়ে রেখেছে তার পুরণো ছাত্রদের স্মৃতি। গোল্ডস্মিথের নিজের হাতে কাঁচের গায়ে নিজের নাম খোদাই করা জানলার টুকরো রাখা আছে আলমারীতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক উল্‌ফটোন—যিনি সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার বাণী ফ্রান্স থেকে আহরণ করে স্বদেশে ছড়িয়ে দেন, ফলে ইংরাজআইনে দণ্ডিত হয়ে কারাকক্ষে আত্মহত্যা করেন—আছে তাঁর আবক্ষ প্রতিমূর্তি, আরও অনেকের।

ট্রিনিটির প্রথম দিকে প্রধান অট্টালিকার দুইপাশে পরীক্ষাগৃহ, আর গীর্জা। পরীক্ষাগৃহে ঢুকতে গিয়ে প্রফেসার বললেন—'অমন যে আমি আমারও বুক কাঁপছে, আর তুমি শিক্ষার্থী, তোমার ত বটেই।' এখানেই পরীক্ষার পর উপাধি বিতরণ করা হয়। বিশেষত্বের মধ্যে আছে স্প্যানিশ আর্মাডা থেকে লুন্ঠিত একটি অর্গ্যান—রাণী প্রথম এলিজাবেথের দান। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১৯০০—ছাত্রী ৬০০। আমাদের দু'একটা কলেজের থেকেও কম। কিন্তু আমাদের কলেজ ত শিক্ষালয় নয়, শুধু শিক্ষার বাজার। বিরাট এলাকা জুড়ে এই কলেজটির চারপাশে মেডিকেল, ল', ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাসাদের সারি। ছেলেদের হোস্টেল কলেজের ভিতরে, আর মেয়েদেরটা বাইরে।

আর একটা বড় দর্শনীয়ও দেখার সৌভাগ্য হল আমার—আমার আইরিশ শুভার্থীদের কল্যাণে।

স্নেহপ্রবণ আইরিশ পরিবারটি যখন শুনল আমি বাঙালী, আর ডি-ভ্যালেরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, পরিবারের কর্তা তাদের প্রিয় 'ড্যাভ্'-এর সংগে আমার একটি appointment করে পরদিন একেবারে সংগে করে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। প্রথমটায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—কি বলব, কি করব। অত বড় একটি মানুষের সংগে কি নিয়ে আলোচনা করব ভেবে ঠিক করতে না পেরে কবিগুরুর একটি 'গীতাঞ্জলি' তুলে দিলাম তাঁর হাতে। তিনিও মনে হোল একটু সংকোচ বোধ করছেন। চোখের সামনে ছায়ার মত ভেসে উঠল—যুবক ডি-ভ্যালেরা, পিয়ার্সন আর তাঁর সহকর্মীর সংগে বোঝাপড়া করছেন। এই দীর্ঘ ঋজুদেহের মধ্যে যেন আত্মগোপন করে আছে সহজাত নেতৃত্ব। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তিনি শুরু করলেন আলোচনা—প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। এক সময় থেমে জিজ্ঞেস করলেন—

যায়। বেকার মায়েদের সন্তানের কোন ব্যবস্থা নেই—স্থান এবং অর্থাভাব।

সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ছেড়ে দেখতে গেলাম বিশ্ববিখ্যাত ট্রিনিটি কলেজ। কলেজের সবচেয়ে পুরনো বাড়ীটি কিন্তু কলেজের চেয়েও ১৫০ বৎসরের ছোট। সুন্দর লাল বাড়ীটি, জন্ম এর ১৫৯১ সালে, ব্যবহৃত হয় আজকাল কলেজের ছাত্রাবাস হিসাবে। এখানকার লাইব্রেরীটি ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎ লাইব্রেরীর অন্যতম। অর্ধলক্ষ বই-এ সাজান হলঘরটি একমাত্র ভার্সাইপ্রাসাদের হলঘরটির থেকে নাকি লম্বায় ছোট। Kells নামে একখানা বই সযত্নে কাঁচের আধারে সাজান আছে, কারুকার্য অপূর্ব। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে—যখন নাকি ইউরোপে সভ্যতার চিহ্নও পাওয়া যায় না—রোম্যান ক্যাথলিক পাদরীরা এই রংগীন ছবির সাহায্যেই বাইবেলের অধ্যায়গুলি জীইয়ে রাখত। কতগুলো প্যাটার্ন বা নক্সা মনে হোল প্রাচ্যদেশীয়। আর্যরা যে প্রাচ্যদেশ থেকে পশ্চিমদিকে যাত্রা করার সময় প্রাচীনতম প্রাচ্য শিল্পকলাও সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তারই প্রমাণ হয়ত। রংগুলি আজ পর্যন্ত ম্লান হয়নি। এর অনুকরণ হয়েছে, কিন্তু একে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি কেউ।

ট্রিনিটি কলেজ বাঁচিয়ে রেখেছে তার পুরণো ছাত্রদের স্মৃতি। গোল্ডস্মিথের নিজের হাতে কাঁচের গায়ে নিজের নাম খোদাই করা জানলার টুকরো রাখা আছে আলমারীতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক উল্‌ফটোন—যিনি সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার বাণী ফ্রান্স থেকে আহরণ করে স্বদেশে ছড়িয়ে দেন, ফলে ইংরাজআইনে দণ্ডিত হয়ে কারাকক্ষে আত্মহত্যা করেন—আছে তাঁর আবক্ষ প্রতিমূর্তি, আরও অনেকের।

ট্রিনিটির প্রথম দিকে প্রধান অট্টালিকার দুইপাশে পরীক্ষাগৃহ, আর গীর্জা। পরীক্ষাগৃহে ঢুকতে গিয়ে প্রফেসার বললেন—'অমন যে আমি আমারও বুক কাঁপছে, আর তুমি শিক্ষার্থী, তোমার ত বটেই।' এখানেই পরীক্ষার পর উপাধি বিতরণ করা হয়। বিশেষত্বের মধ্যে আছে স্প্যানিশ আর্মাডা থেকে লুণ্ঠিত একটি অর্গ্যান—রাণী প্রথম এলিজাবেথের দান। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ১৯০০—ছাত্রী ৬০০। আমাদের দু'একটা কলেজের থেকেও কম। কিন্তু আমাদের কলেজ ত শিক্ষালয় নয়, শুধু শিক্ষার বাজার। বিরাট এলাকা জুড়ে এই কলেজটির চারপাশে মেডিকেল, ল', ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাসাদের সারি। ছেলেদের হোস্টেল কলেজের ভিতরে, আর মেয়েদেরটা বাইরে।

আর একটা বড় দর্শনীয়ও দেখার সৌভাগ্য হল আমার—আমার আইরিশ শুভার্থীদের কল্যাণে।

স্নেহপ্রবণ আইরিশ পরিবারটি যখন শুনল আমি বাঙালী, আর ডি-ভ্যালেরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, পরিবারের কর্তা তাদের প্রিয় 'ড্যাভ্'-এর সংগে আমার একটি appointment করে পরদিন একেবারে সংগে করে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। প্রথমটায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—কি বলব, কি করব। অত বড় একটি মানুষের সংগে কি নিয়ে আলোচনা করব ভেবে ঠিক করতে না পেরে কবিগুরুর একটি 'গীতাঞ্জলি' তুলে দিলাম তাঁর হাতে। তিনিও মনে হোল একটু সংকোচ বোধ করছেন। চোখের সামনে ছায়ার মত ভেসে উঠল—যুবক ডি-ভ্যালেরা, পিয়ার্সন আর তাঁর সহকর্মীর সংগে বোঝাপড়া করছেন। এই দীর্ঘ ঋজুদেহের মধ্যে যেন আত্মগোপন করে আছে সহজাত নেতৃত্ব। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তিনি শুরু করলেন আলোচনা—প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। এক সময় থেমে জিজ্ঞেস করলেন—

আমি কি করি, আর কি উপলক্ষ্যেই বা ইংল্যাণ্ডে এসেছি। শিক্ষকতা আমার পেশা শুনে তিনি হয়ে উঠলেন শিশুর মত উচ্ছ্বসিত। বললেন—'জান আমিও শিক্ষক ছিলাম।' মনে পড়ে গেল আমাদের 'মাস্টারদা' সূর্যসেনের কথা—তিনিও শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শ পেলে আমরা কত ভাগ্যবান মনে করতে পারতাম নিজেদের আজ। চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিদাতার কণ্ঠস্বরে—'আচ্ছা, শিক্ষকতা করতে হলে কোনো বিশেষ শিক্ষা দরকার একথা তোমরা ভাব কেন? শিক্ষাদাতার অকৃত্রিম আন্তরিকতা আর শিক্ষার্থীর জ্ঞানপিপাসাই কি যথেষ্ট নয়?' বললাম—'আমরা বর্তমানে যে যুগে বাস করছি তা বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না থাকলে যেমন কোন তথ্যই কেউ বিশ্বাস করে না, শিক্ষকত্বের শীলমোহর করা ডিগ্রী না থাকলে—আমার যত কৃতিত্বই থাক না কেন—মানবে না যে কেউ।'

অনেক কথাই ভেবেছিলাম জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু ঐ মহান ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে সব কথাই বোধ হয় ভুলে গেলাম। সময়ও বেশী ছিল না—মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটীশে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাই দশ মিনিট পরই ফিরে আসতে হোল। তাঁর সেক্রেটারী বললেন—তিনি একটি জরুরী মিটিং থেকে উঠে এসেছেন এবং সেখানেই তাঁকে ফিরে যেতে হবে এক্ষুণি। তাঁর এই অসাধারণ সৌজন্য আইরিশ চরিত্রের আর একটি দিক আমার কাছে তুলে ধরল। মনে হল, সাধারণ মানবীয় গুণে এদেশের মানুষ সত্যিই হৃদয়বান।

"আয়ার"-এর গ্রামে

আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষকে আমরা ভালোবাসি—হয়ত আমাদের সম-দুঃখের ভাগী বলে, আর সেই দুঃখটা দু'দলেরই ইংরেজ শাসকদের হাতে

সইতে হয়েছে বলে। পৃথিবীতে এ বাঁধন, বড় সহজ বাঁধন নয়। তাই আয়ার্ল্যাণ্ডের দুঃখের শেষ ঘটে নি বলে, দুঃখটাও আমার কম হয় নি। বিশেষ করে আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষকে যেমন ভালো লাগ্‌ল, তেমনি ভালো লাগল আমার আয়ার্ল্যাণ্ড দেশকেও—শহর, গ্রাম সব দেখতেই ছিল আমার সাধ। কারণ, আমাদের কাছে আয়ার্ল্যাণ্ড যেন স্বপ্নে দেখা দেশ।

তাই যখন বান্ধবীর হাত ধরে ঐ ছোট আইরিস গ্রামটির পথে পা বাড়ালাম, মনে হ'ল বাড়ীর কাছে এসেছি। রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলো মনে করিয়ে দেয় দেশবিভাগের আগে দেখা কোন মফঃস্বল শহরের পরিচ্ছন্ন বাঙালী আবাসের কথা। নিজের অজ্ঞাতেই গলার কাছটা ভারী হয়ে এল। বান্ধবীর সাড়া পেয়ে সম্বিত ফিরে এল। শুনলাম সে বলে যাচ্ছে—"জান আমরা আমাদের এই ২৪টা কাউন্টি নিয়ে স্বাধীন 'আয়ার' তৈরী করেছি বলে ইংরাজরা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট। ওরা মনে করে আমরা মূর্খ, কৃপার পাত্র। আমরা কিন্তু নিজেদের নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট। আর যদিও আমাদের দেশ গরীব, আমরা তার জন্য পরোয়া করি না; আমরা আবার আমাদের দেশ গড়ে তুলব।" আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে: এ বলে কি? এরাও তাহলে কেবল আত্মতুষ্ট নয়, দেশের কথা ভাবে।

চমৎকার ঝকঝকে সবুজ বাস চলে যাচ্ছে গ্রাম হতে গ্রামে। লোক্যাল যাত্রীবাহী ট্রেনগুলো সময় মতন যাওয়া আসা করছে। লোকেরা গায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে না, মেয়েরা অবাধে দোকান, বাজার, অফিস, স্কুল, কলেজ যাওয়া আসা করছে। সবই যেন খুশীতে ঝলমল করছে। এদের দেশ যদি সমস্যা-সংকুল বলতে হয়, আমরা তাহলে কোথায় আছি। বললাম, "অভিনন্দন জানাই তোমার স্বাধীন 'আয়ার'কে—আর তোমার মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাকে।"

কথায় কথায় আমরা এসে পৌঁছলাম 'ডানলেয়ারী' গ্রামে। পাহাড়ী রাস্তা, এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে উপর হতে নীচে, নীচ হতে উপরে। খানিক দূরেই রেলওয়ে ব্রিজ। রাস্তার নীচ দিয়ে ট্রেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যাত্রীর দল—নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে। এদের নিয়ে ছেড়ে দেবে ডাবলিন শহরে—সারাদিনকার কাজে যাবার জন্য। আবার ঘরের ছেলেদের ফিরিয়ে আনবে সন্ধ্যার পর। বেশীর ভাগ বড় বড় রাস্তাগুলোই বাস-রাস্তা। ট্রাম অনেক দিন হল বিদায় নিয়েছে ডাবলিনের বুক হতে। ছোট ছোট বাড়ী রাস্তার দু'পাশে, সামনে ছোট একটু লন, ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা সীমানা। একটা দুটো ফুলের চারা, কোথাও বা একটু পরিচ্ছন্ন বাগান। লাল টালির ছাওয়া এই বাংলোগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে ক্লান্ত পথিকদের। হোটেল বা দোকানগুলো নিঃশব্দ, জনবহুল নয় বলে হয়ত কলরব করে উঠল না। ঐরূপ পরিচ্ছন্ন আর শোভন একটি বাড়ীর ভিতর ঢুকে ঘণ্টা বাজালাম। যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁর সংগে আলাপে বুঝলাম —আমি এবার বিশ্রামাগারে এসেছি।

স্নেহপ্রবণ আইরিস পরিবারটি মনে করিয়ে দিচ্ছিল—ছোটবেলায় যখন খেতে বসতাম, মা পরিবেষণ করতেন, পরিবারের সকলে মিলে মনের আনন্দে খাওয়া দাওয়ার সাথে চলত গল্পগুজবের পালা—সেদিন যেন ফিরে পেলাম আবার ;—তফাৎ শুধু গল্পের ধারা আর পারিপার্শ্বিকের। জোন সিগারেটটি মুখে নিতেই, তার বাবা দেশলাই জেলে ধরিয়ে দিলেন। ওর মা বললেন, "জোন, সিগারেট খাওয়াটা একটু কমাও। সারারাত ধরে ত পার্টিতে নেচে এলে, তোমার ছেলে যে এদিকে আমার ভক্ত হয়ে উঠল সেদিকে খেয়াল আছে?" তার ছোট বোন বলল, "আহা বেচারা, স্বামী

গেল যুদ্ধ করতে, ও একটু আমাদের সংগে ফুর্তি করছে, তুমি আপত্তি করছ কেন? তুমি খোকনকে বেশি আদর করো না তাহলেই ত হোলো। কাল আমি তোমার সব কাজ করে দেব।” তার বাবা বললেন, “আর তোমার যে, তোমার ছেলে বন্ধুদের পার্টিতে নেমন্তন্ন তার কি হবে? আচ্ছা দাঁড়াও, কাল ত ছুটির দিন, আমি তোমার ভাগের কাজটা করব।”

আমি নিঃশব্দে ওদের সহজ সরল কথাবার্তা শুনছিলাম। অনভ্যস্ত কাণে ও চোখে এগুলো বড়ই বেসুরো লাগছিল। কিন্তু নিজের মনের সংগে সমালোচনা করে দেখলাম—জীবনের সহজ সত্য গোপন না করে বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে মিলে পরম আনন্দে ওরা এসব উপভোগ করে—শ্রীহীন নয় কিছুই।

বাড়ীতে ঝি চাকরের বালাই নেই। পরিবারের সকলে মিলে পালা করে সব কাজ করে। আমাদের মত ঝাঁটা হাতে ঘর ঝাঁট দেওয়া, আর ছাই মাটি দিয়ে বাসন মাজতে না হলেও বাড়ীতে কাজের অভাব নেই। তার জন্য কারোর কোন আমোদ আহ্লাদ বা নাচগানে সময়ের অভাব হয় না। ছুটির দিনে দলবেঁধে হৈ চৈ করলাম যেদিন সেদিন একটা জিনিসের অভাব দেখলাম—‘ওরে চা নিয়ে আয়, পান আন,’ ইত্যাদির। বাবা মা ভাইবোন বন্ধু (ছেলেমেয়ে) সকলে মিলে তাশ খেলছে, হাসছে। অনেকদিন পর প্রাণখোলা হাসির সন্ধান পেলাম। ঠিক চায়ের সময় যার সেদিনকার ডিউটি সে উঠে গেল। ডাক পড়ল চায়ের টেবিলে, আবার শুরু হল কাজ ও কথা, রাত্রের খাওয়ার আগে পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৭টা)। পৌনে সাতটা বাজতেই সকলে উঠে যে যার বাড়ী চলে গেল। আমরা গেলাম আমাদের টেবিলে। এই সময়নিষ্ঠার সংগে আমাদের দেশের তুলনাটা

নিতান্ত অসংগত ভাবেই চোখের সামনে ভেসে উঠল—রাত বারোটা, বাঙালী বাড়ীর গৃহিণী হয়ত হেঁসেলে খাবার ঢাকা দিয়ে বসে ঢুলছেন, কখন আড্ডা ভাঙবে আর সকলে খেয়ে তাঁকে একটু সুযোগ দেবে বিশ্রামের—পরদিনের বাঁধা রুটিনের জন্য।

হঠাৎ সবচেয়ে ছোট মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল—"বরফ পড়ছে। তুমি যে বলেছিলে বরফপড়া দেখনি—শীগ্‌গির এস।" তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম।

রাশি রাশি পেঁজা তুলোর সারি আকাশ থেকে কে যেন ছুঁড়ে মারছে—চারদিক শাদা হয়ে গেছে। এ যেন সেই রূপকথার রাজ্য—দুধসাগরের পারে এসে পৌঁছেছি। পাতাশূন্য গাছগুলো মুক্তাবিন্দুর সারিতে সেজে দাঁড়িয়ে আছে—মিলনের লগ্নের প্রত্যাশায়। দরজা খুলতেই এক ঝলক নীলাভ আলোতে ওরা হেসে উঠল—নতুন বছরকে জানাল অভিনন্দন।

ছয় ইঞ্চি পুরু বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যখন হোটেলে ফিরে এলাম, রাত তখন বারোটারও বেশী। জানালা দিয়ে আবার তাকালাম ছোট গ্রামটির দিকে। নূতন বছরের জন্য অপরূপসাজে সেজে ক্লান্ত পথিককে 'গ্লেনগেয়ারী' জানাল স্বাগত সম্ভাষণ।

কিলানী পাহাড় (Killieny)। ছোট একটি পাহাড়চূড়া, তার উপর থেকে সাগর আর সাগরবেলার দৃশ্য ভারী চমৎকার দেখায়। আমাদের দেশের মত আকাঙ্ক্ষাপূরণের ব্যবস্থাও আছে। একটি বেদী, দুটো গাছের মাঝখানে আর একটা জায়গা, এসব হল ইচ্ছা জানাবার জন্য; তাহলে পুরণ হবার আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে। পাশেই আর একটা পাহাড়ের উপর একটা পরিত্যক্ত প্রাসাদের অথবা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। কেউ বলে নর্ম্যান দুর্গের চিহ্ন,

কেউ বলে ড্যানিস। কিলানী পাহাড়ের উপর থেকে সাগরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা যায়, একটি লাইটহাউস—মনে হয় লাল ঘাগরা পরা ছোট একটি মেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

উত্তরদিকে তাকালে দেখা যায় ডাবলিন পাহাড়ের চূড়া—সবচেয়ে উঁচু চূড়ার নাম 'সুগারলোফ্'। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে আসার রাস্তা বাঁধান। শীতকালে যখন বরফে ঢেকে যায়, ঢালু রাস্তা বেয়ে নকল শ্লেজ করে নেমে আসে উৎসাহী স্বাধীন আইরিশ ছেলেমেয়ের দল। পাহাড়ের উপরকার বনানী অপূর্ব রূপ ধারণ করে বসন্তসমাগমে।

রাস্তায় চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম বান্ধবীকে, "আচ্ছা— তোমরা, আইরিশরা কি সাংঘাতিক লোক বলত! সবকিছুই মেরে ফেলতে ভালবাস কেন?" সে ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল— আমি বললাম—"তোমাদের পাহাড়ের নাম Kill-eny ; দোকানের নাম Kil-dare ; Kilkennes গ্রাম ; তোমাদের আরও কতগুলো দেখলাম kill দিয়ে আরম্ভ। মনে হচ্ছে তোমাদের দেশে এসে ভাল কাজ করিনি।" ব্যাপারটা এবার বুঝতে পেরে সে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "আরে ওটা ইংলিশ নয়—আইরিশ kill— মানে গীর্জা। তাই আমাদের সব কিছুরই আগে 'কিল'।" আমি বললাম, "বাঁচা গেল—দুর্ভাবনা হচ্ছিল তোমাদের জন্য—কেননা Kill-bride— রাস্তার নাম।"

ধর্মনিষ্ঠ জাত এরা। দেশের বড় বড় পদগুলো থেকে আরম্ভ করে ছোটগুলো পর্যন্ত বেশীর ভাগই রোমান ক্যাথলিক। টিসক্ (প্রধানমন্ত্রী) নিজে রোম্যান ক্যাথলিক। বাধানিষেধ আমাদের দেশেরই মত। বিবাহ বন্ধন শিথিল হয় না এক পক্ষের মৃত্যু ভিন্ন। বিধবা

নিতান্ত অসংগত ভাবেই চোখের সামনে ভেসে উঠল—রাত বারোটা, বাঙালী বাড়ীর গৃহিণী হয়ত হেঁসেলে খাবার ঢাকা দিয়ে বসে ঢুলছেন, কখন আড্ডা ভাঙবে আর সকলে খেয়ে তাঁকে একটু সুযোগ দেবে বিশ্রামের—পরদিনের বাঁধা রুটিনের জন্য।

হঠাৎ সবচেয়ে ছোট মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল—"বরফ পড়ছে। তুমি যে বলেছিলে বরফপড়া দেখনি—শীগ্‌গির এস।" তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম।

রাশি রাশি পেঁজা তুলোর সারি আকাশ থেকে কে যেন ছুঁড়ে মারছে—চারদিক শাদা হয়ে গেছে। এ যেন সেই রূপকথার রাজ্য—দুধসাগরের পারে এসে পৌঁছেছি। পাতাশূন্য গাছগুলো মুক্তাবিন্দুর সারিতে সেজে দাঁড়িয়ে আছে—মিলনের লগ্নের প্রত্যাশায়। দরজা খুলতেই এক ঝলক নীলাভ আলোতে ওরা হেসে উঠল—নতুন বছরকে জানাল অভিনন্দন।

ছয় ইঞ্চি পুরু বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যখন হোটেলে ফিরে এলাম, রাত তখন বারোটারও বেশী। জানালা দিয়ে আবার তাকালাম ছোট গ্রামটির দিকে। নূতন বছরের জন্য অপরূপসাজে সেজে ক্লান্ত পথিককে 'গ্রেনগেয়ারী' জানাল স্বাগত সম্ভাষণ।

কিলানী পাহাড় (Killieny)। ছোট একটি পাহাড়চূড়া, তার উপর থেকে সাগর আর সাগরবেলার দৃশ্য ভারী চমৎকার দেখায়। আমাদের দেশের মত আকাঙ্ক্ষাপূরণের ব্যবস্থাও আছে। একটি বেদী, দুটো গাছের মাঝখানে আর একটা জায়গা, এসব হল ইচ্ছা জানাবার জন্য; তাহলে পূরণ হবার আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে। পাশেই আর একটা পাহাড়ের উপর একটা পরিত্যক্ত প্রাসাদের অথবা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। কেউ বলে নর্ম্যান দুর্গের চিহ্ন,

কেউ বলে ড্যানিস। কিলানী পাহাড়ের উপর থেকে সাগরে একটি ছোট দ্বীপ দেখা যায়, একটি লাইটহাউস—মনে হয় লাল ঘাগরা পরা ছোট একটি মেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

উত্তরদিকে তাকালে দেখা যায় ডাবলিন পাহাড়ের চূড়া—সবচেয়ে উঁচু চূড়ার নাম 'সুগারলোফ্'। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নেমে আসার রাস্তা বাঁধান। শীতকালে যখন বরফে ঢেকে যায়, ঢালু রাস্তা বেয়ে নকল শ্লেজ করে নেমে আসে উৎসাহী স্বাধীন আইরিশ ছেলেমেয়ের দল। পাহাড়ের উপরকার বনানী অপূর্ব রূপ ধারণ করে বসন্তসমাগমে।

রাস্তায় চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলাম বান্ধবীকে, "আচ্ছা—তোমরা, আইরিশরা কি সাংঘাতিক লোক বলত! সবকিছুই মেরে ফেলতে ভালবাস কেন?" সে ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—আমি বললাম—"তোমাদের পাহাড়ের নাম Kill-eny; দোকানের নাম Kil-dare; Kilkennes গ্রাম; তোমাদের আরও কতগুলো দেখলাম kill দিয়ে আরম্ভ। মনে হচ্ছে তোমাদের দেশে এসে ভাল কাজ করিনি।" ব্যাপারটা এবার বুঝতে পেরে সে হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "আরে ওটা ইংলিশ নয়—আইরিশ kill—মানে গীর্জা। তাই আমাদের সব কিছুরই আগে 'কিল'।" আমি বললাম, "বাঁচা গেল—ভুর্ভাবনা হচ্ছিল তোমাদের জন্য—কেননা Kill-bride— রাস্তার নাম।"

ধর্মনিষ্ঠ জাত এরা। দেশের বড় বড় পদগুলো থেকে আরম্ভ করে ছোটগুলো পর্যন্ত বেশীর ভাগই রোমান ক্যাথলিক। *টিসক্* (প্রধানমন্ত্রী) নিজে রোম্যান ক্যাথলিক। বাধানিষেধ আমাদের দেশেরই মত। বিবাহ বন্ধন শিথিল হয় না এক পক্ষের মৃত্যু ভিন্ন। বিধবা

বা বিপত্নীকের বিয়ে করাটাই স্বাভাবিক। বাবা বিয়ে করে এনেছেন বলেই তাকে 'মা' সেজে বসতে হবে, এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। ছেলেমেয়েরা যদি নিতান্ত শিশু না হয় তাহলে বরং নূতন 'মা'কে নাম ধরেই ডাকে; একে কেউ দোষণীয় মনে করে না। আর আত্মীয় স্বজনও বসে থাকে না দেখবার জন্য, এই বুঝি সৎমা তাড়না করল ছেলেদের। ফলে দু'পক্ষের মধ্যেই খানিকটা সহিষ্ণুতা, আর সহানুভূতি অবশিষ্ট থাকে।

আইরিশ তরুণ-তরুণীদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি পেয়েছি বিদেশী বলে। ইংল্যাণ্ডে যখন প্রথম আসি, পদে পদে হোঁচট খেয়ে শিখতে হয়েছে তাদের আচার ব্যবহার। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে রাস্তাঘাটে জিজ্ঞাসা করলে জবাব অবশ্য পেয়েছি। তবে ইংরেজ যেন বড় বেশী আদব-কায়দাদুরস্ত। আর হয়ত 'কালা আদমী'র প্রতি কিছুটা 'বিদ্বেষ ও অনুকম্পা' সম্পন্ন। কিন্তু এই আইরিশদের সংগে যেখানেই মিশেছি যেন ফিরে পেয়েছি প্রাণ। হয়ত দুইই শোষিত জাতি বলে অবজ্ঞাত মনের কোণে এদের সংগে আছে মিল। তাই সহজেই এদের সংগে মিতালি হয়ে যায়। ট্রেনে, স্টীমারে, রাস্তায় যখনই অস্বস্তি বোধ করেছি এরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। রাস্তার পাশে সবুজ বাক্সটার পাশে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছি, চিঠিটা পোস্ট করি কোথায়? একটি মেয়ে এসে বলল, "চিঠি পোস্ট করবে বুঝি? তোমার পাশেই ত বাক্স।" বাসের কণ্ডাক্টারকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম গন্তব্যস্থলের কথা, পাশের ছেলেটি বলে উঠল, "আরে আমি ত ঐ রাস্তাতেই যাব, তোমায় নামিয়ে দেব'খন।" একসংগে রেস্টুরেণ্টে খেয়ে যখন বিলের অংশ নিতে গেলাম, ভদ্রমহিলা বললেন, "তোমার দেশে যখন যাব, তুমি সব দামটাই দিও,

একটুও আপত্তি করব না।" যার সংগে দেখা করতে গিয়েছি সেই বলেছে, "আরে তুমি ইণ্ডিয়া থেকে আসছ। কত যে শুনেছি তোমার দেশের কথা!—একটু বল ত?" তাই বোধ হয় এদের যখন ছেড়ে এলাম মাত্র সাতদিনের পরিচয়েও অনুভব করলাম, প্রিয়-সান্নিধ্য ত্যাগের বেদনা। এরা আমাদের আপনজন। সম-দুঃখের বাঁধনে আমরা আত্মীয়। এখন দুঃখটা দুজনেরই শেষ হলে যেন আরও খুশী হই।

প্যারিস

লণ্ডন-ভিক্টোরিয়া স্টেশনে গাড়ী ধরে প্রথম গেলাম হ্যাভেন পোর্ট-এ। সেখান থেকে ছোট একখানি স্টীমার আমাদের নিয়ে গেল দিয়েপ বন্দরে, আমরা পৌছলাম ফ্রান্সে। ছোট স্টীমার, দুলুনি অত্যন্ত বেশী। তার উপর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বেশী হওয়ায়, ভিড়ের কষ্টটা অনুভব করলাম বেশ ভালই। আবার ডাঙ্গায় নেমে উঠলাম গাড়ীতে। বেশ বোঝা গেল ফ্রান্সে এসে পড়েছি, দুদিকে অপূর্ব সবুজের সমারোহ, তারই মাঝে মাঝে ফুলের রাশি। হাস্যমুখর নরনারীর কোলাহল। সব মিলে মনটা প্রসন্ন করে তুলল। সন্ধ্যা ছয়টায় পৌছলাম প্যারিসে; সে স্টেশনটির নাম সাঁ লাজারা।

হোটেলের সন্ধানে বের হলাম। ঠাঁই নাই কোথাও; সর্বত্র বিদেশী-বিদেশিনীদের ভিড়। যেখানে পাওয়া যায় সেখানে প্রবেশ করা সাধারণ ভারতীয়দের পক্ষে দুঃসাধ্য—বর্ণবিদ্বেষ নয়, অর্থসঙ্কট। লণ্ডন মহানগরীতে একরাত্রি বাস করতে হলে সাধারণ হোটেলের দক্ষিণা আনুমানিক এক পাউণ্ড। প্রথম যখন এক পাউণ্ড ভাঙিয়ে ফরাসী কাগজে ৯৬০ ফ্রাঁ পেলাম, আমার আনন্দ দেখে কে? মনে হল খুব কম খরচায় প্যারিস দেখা সেরে ফিরে আসব। কিন্তু, "বাহিরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল"। কে জানত যে প্যারিস মহানগরীতে এক রাত্রির বিছানা ভাড়া ১০০০ ফ্রাঁ। অনেক চেষ্টার পর একটা সাধারণ হোটেল পাওয়া গেল যেখানে মাত্র কয়েকটি ঘর খালি ছিল। প্রতিটি ঘরের দর্শনী ৪৭০ ফ্রাঁ। যাক্ তবু মন্দের ভাল। মাল বলতে ত ছোট দুটি ব্যাগ, সেগুলো হোটেলওয়ালার জিম্মায় রেখে বেরিয়ে পড়লাম কিছু খাবারের সন্ধানে,

তার সংগে কিছু উপরিলাভ হবে—কয়েকটি রাস্তার ও দু'-একটি দ্রষ্টব্য স্থানের সংগে প্রথম পরিচয়।

হোটেলের নীচেই একটি রেস্তোরাঁ ছিল। সেখানে প্রবেশ করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম। এত বড় এবং এমন ঝকঝকে চায়ের স্টল ত কই কোন দিন দেখিনি—চার দিক দিয়েই লোক প্রবেশ করছে, আর চার দিকেই খাবারের সারি। ব্যাপারটা খানিক পরেই বোধগম্য হল, যখন দেখলাম আমিও প্রবেশ করছি আমার বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে। দোকানটি নিতান্তই ছোট—আর তার দেয়াল বলতে কিছুই নেই। রাস্তার দিকটা বাদ দিয়ে তিন দিকেই ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত, কেবল ঝক্‌ঝকে আয়নায় ঢাকা। ফলে যেদিকে তাকাই মনে হয় এর সীমা নেই। কেউ বা দাঁড়িয়েই তরল পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছে, কেউ বা বসেছে, কেউ বা প্রতীক্ষা করছে কারুর জন্য। আমি একটা টেবিল দখল করে বসলাম। এবার শুরু হল ভাষা-সমস্যা—কি করে বোঝাই আমি কি চাই। একটি 'ওয়েটার' এগিয়ে এল। তাকে বোঝাতে চাইলাম 'চাই কিছু খাবার'। সে কেবল তাকিয়ে রইল সহাস্যমুখে। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল, উঠে গিয়ে চায়ের পাত্রটি দেখিয়ে দিলাম, আর রুটি ডিম। সে খুশী হয়ে খানিক পরে এনে সে সব হাজির করলে।

ভোজনপর্ব কোন রকমে সমাপ্ত করার পর দাম দেবার বেলায় সে নিজেই আর একটি ওয়েটারকে নিয়ে এল সংগে করে। সে বুঝিয়ে দিলে কাগজে লিখে যে, আমি খেয়েছি চা-৪৫ ফ্রাঁ, রুটি-৩৫ ফ্রাঁ, ডিম-৩০, মোট—১১০ ফ্রাঁ। আমার ত চক্ষু স্থির। ব্যাপার দেখে ওয়েটার ত হেসেই বাঁচে না। সে আমাকে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দিলে, প্রত্যেকটি জিনিসের নীচে দাম লেখা আছে। দেখলাম একটি সাধারণ কলার দাম ৪০ ফ্রাঁ। অর্থাৎ আমাদের দেশীয় মুদ্রায় দশ আনা। কোন জিনিস ২০ ফ্রাঁর নীচে বিক্রয় হয় না। স্তূপাকার কাগজের টাকা দিয়ে সব জিনিস কিনতে হয়, শুধুই কাগজের ছড়াছড়ি। সোনা বা রূপার ধার ধারে না। এর হাত হতে ওর হাতে ক্রমশ কাগজ উড়ে যাচ্ছে, আর জীবনধারণের খরচা ক্রমশই চড়ে যাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি অসম্ভব বেড়ে গেছে। কিন্তু তার জন্য কারু বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে ত মনে হ'ল না। অবশ্য আমি ছিলাম রাজধানীতে এবং সেখানে চিন্তাকুল মুখ ত দেখলাম না। সকলেই সহাস্যমুখে আপন কাজ করে যাচ্ছে, খাবার সময় হোটেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকে খেয়ে নিচ্ছে, ঝকঝকে তকতকে পোশাক পরা, জীবনটাকে যেন নিতান্ত খেলার ছলে ভোগ করে দুনিয়ার সবটুকু সুখ নিংড়ে নিতে চাইছে। দেখে ত মনে হয়—এরাই সত্যিকারের সুখী। এ যেন "নগদ যা পাও, ভোগ করে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক"।

টিউব স্টেশনে এসে মনস্থ করলাম Concorde দেখতে যাওয়া যাক্। প্যারিস আসার পথে এক ফরাসী ভদ্রমহিলার সংগে আলাপ হয়; তিনি কয়েকটা দ্রষ্টব্য স্থানের নাম বলেছিলেন। তার মধ্যে Concorde একটা। বহু ভাষাবিভ্রাট এড়িয়ে যখন Concorde এসে পৌঁছলাম, রাত তখন নটা। অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম প্যারিসের প্রশস্ত রাজপথের দিকে। এত বড় এবং এত চঞ্চল রাস্তা যে থাকতে পারে কোথাও, তা যেন কল্পনার বাইরে ছিল। ৬টি রাস্তা এসে মিশেছে যেখানে সেখানে একটা স্মৃতিস্তম্ভ— Palajs de la concorde এখানে Mary Antionette, Louis XIV, Louis XVI এবং আরও কয়েকজনকে guillotin করা

হয়। সেই রক্তাক্ত স্মৃতি ফ্রান্স ভুলতে পারে নি, তার ফলেই সে লাভ করেছে স্বাধীনতার আশীর্বাদ। প্রতিটি রাস্তার দুইপার্শ্বে অপূর্ব আলোকমালার সারি, আর প্রতিটি রাস্তা দিয়ে সেকেণ্ডে অন্তত ২০টি মোটর চলেছে গন্তব্য অভিমুখে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করলাম রাস্তা পার হবার জন্য। কিন্তু কার সাধ্য ঐ বিংশশতাব্দীর গতির সামনে এগিয়ে যায়। অনেক ইতস্তত করে বারকয়েক হোঁচট খেয়ে যখন রাস্তা পেরিয়ে গেলাম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হলনা। যেদিকে দুচোখ যায় সবুজ ঘাসের মেলা, যত্ন করে তৈরী করা ফুলের রাশি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট চেয়ার—শ্রান্ত পথিকের বিশ্রামের জন্য। সাজান গোছান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পার্ক দেখে মনে হল—এরা জানে কি করে মানুষের চোখকে তৃপ্তি দিতে হয়। বিধাতার দান এরা দুহাত ভরে নিতে পেরেছে—পেরেছে সে আশীর্বাদের ধারাকে নিজেদের তৃপ্তির ছোঁয়ায় পবিত্র করতে।

পরদিন ভোরবেলা—অবশ্য আমাদের ভোর নয়, পশ্চিমের সকাল। বেলা দশটায় আবার বের হলাম Louvre Museum-এর উদ্দেশ্যে। পথ জানি না, ভাষা জানি না, শুধু জানি গন্তব্যস্থলের নাম —তাও ভাল করে উচ্চারণ করতে পারি না। কারণ আমরা বিদেশী, বিদেশীর ভাষা শুধু অক্ষর দিয়ে জানি—তার স্বদেশীয় উচ্চারণ লোকের মুখে মুখে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তার খবর রাখি না। তাই যখন নির্বান্ধব প্যারিসের রাজপথের পথিককে জিজ্ঞাসা করলাম 'লুভার্ কোথায়,' কেউ বা তাকিয়ে হাসল, কেউ বা বলল 'ঐদিকে।' যাকে দেখলে মনে হয় এ হয়ত আমাদের 'বঙ্গভাষা' ইংরেজী বুঝবে, তাকেই জিজ্ঞাসা করি—কেউ বা জবাব দেয়, কেউ বা বিদেশী দেখে কৃপা করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে,

কারণ সে আমাদের ভাষা জানে না। অশেষ দুর্গতি ভোগ করার পর খুঁজে পেলাম আমাদের গন্তব্যস্থল, আমাদের প্যারিসের অতীত স্মৃতি 'লুভ মিউজিয়ম' Louvre Museum। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ অট্টালিকা (ফরাসীরা বলে) এই Louvre. ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এটা ছিল ফ্রান্সের রাজনিবাস। ৪৮ একর জমির উপর চতুর্দিক দিয়ে বিস্তৃত এই অট্টালিকা, ফরাসী স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। ১৭৯৩ খৃঃ ফরাসী বিপ্লবের পর এই অট্টালিকা ব্যবহৃত হয় ফরাসী সাম্রাজ্যের শিল্পাগার হিসাবে। নানা বিভাগে ভাগ করে এক একটি অংশে করা হয়েছে এক এক জাতীয়-শিল্পের সমাবেশ। এখানে আছে ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ভেনাস-ডি-মিলো। গ্রীক ভাস্করের পাথর কেটে গড়া মূর্তি, ভেনাস দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ মহিমায়। শিল্পী রয়ে গেছে অজানার অন্ধকারে, কিন্তু ভেনাস সগৌরবে ঘোষণা করছে মানুষের জয়গান। কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করতে পারে নি। মূর্তিটির হাত দুটি ভেংগে গিয়েছে, পিঠের স্থানে স্থানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্যের বা অপরূপ লাবণ্যের হানি হয়নি কোথাও। স্মিতহাস্যে, অশেষ লাবণ্যময়ী ভেনাস, জগতের সমক্ষে দাঁড়িয়ে বলছে, "আমি মানুষের সেরা সৃষ্টি"। লোক-চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে বসে যে শিল্পী এমন প্রতিমা গড়ে তুলতে পারে, তার শক্তির কথা ভাবলে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাই জাগে। তিল তিল করে গড়ে তোলা তিলোত্তমা—জগতের যত লাবণ্য, যত কোমলতা সবই কি একত্রিত হয়েছে ঐ ভেনাসের মুখে বক্ষে দেহ-সুষমায়? বিধাতার সৃষ্টি এ নয়, মানুষের প্রেমে, মানুষের শক্তিতে শিল্পীর আপন মনের মাধুরী মিশায়ে সৃষ্টি হয়েছে এর। তাই সে এত সুন্দর, এত মধুর।

লুভ মিউজিয়ামের এক অংশে গ্রীক ভাস্কর্যের আরও দু'একটি মূর্তি পাওয়া যায়। একটি বিশ্ববিখ্যাত এপোলোর মূর্তি। আর একটি দেবী মিনার্ভার। একটি পাথরের মূর্তির উপর আর একটি রংগীন পাথর দেবীর গায়ে চাদরের মত করে বসান হয়েছে। দেবী নিষ্প্রভ হয়ে গেছে তার স্রষ্টার প্রতিভার জ্যোতিতে। অধিকাংশ মর্মরমূর্তির বিশেষত্ব এই, তাদের দেহের প্রতিটি রেখা, বস্ত্র বা দেহাবরণের প্রতিটি ভাঁজ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে শিল্পীর হস্তস্পর্শে।

মিউজিয়ামের অন্য একটি অংশে আছে সেরা রংগীন চিত্র। তাদের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন শিল্পরীতি অনুসারে। বিভিন্ন দেশের চিত্রাবলী নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে দ্যা ভিঞ্চির ছবি, রাফায়েলের মাতৃমূর্তি, প্রভৃতি জগতের যত সেরা চিত্র। এই দুটো গ্যালারী দেখা শেষ করে যখন বেরিয়ে এলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে প্যারীর বুকে। লুভ-এর অন্য অংশে কি আছে তা দেখার আর সময় হল না। লুভ—পৃথিবীর বিলাসী জাতের সর্বাপেক্ষা বিলাসী সম্রাটগণের লীলানিকেতন। ঐ মর্মর মন্দির কালের আহ্বান উপেক্ষা করে এখন আহ্বান করছে যত শিল্পবিলাসীকে তার অপরূপ সংগ্রহ দেখবার জন্য।

পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটি আফিস বার করা গেল। সেখান থেকে বিদেশীদের প্যারিসের বিভিন্ন অংশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়, তাদের সংগে থাকে ইংরেজী ভাষাজানা গাইড। ওদের সংগে ব্যবস্থা করলাম একবেলা দেখাবে ঐতিহাসিক প্যারিস, একবেলা আধুনিক প্যারিস আর একবেলা দেখাবে বিশ্ববিখ্যাত ভার্সাই নিকেতন। সকাল ১১টায় রওনা হওয়া গেল ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। প্রথমেই পেলাম সেন্ট ম্যাগডেলিন

গীর্জা। সপ্তদশ শতাব্দীর এই গীর্জাটি বহন করছে গ্রীক ভাস্কর্যের নিদর্শন। গীর্জার মধ্যে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি সত্যিই সুন্দর। এরপর আমরা দেখতে পেলাম নেপোলিয়ানের সমাধি-মন্দির। সমাধিস্থানটি মেঝে থেকে প্রায় ৬ ফীট নীচে। খ্রীষ্টের দশজন শিষ্যের প্রস্তরমূর্তি সমাধিস্থানটির চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে যেখানে খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি রক্ষিত আছে, সেই বেদীর উপরিভাগ (অনেকটা আমাদের দেবতার চতুর্দোলার মত) হতে আলো ঠিকরে পড়ছে সোনালী painting-এর ভিতর হতে। কোনরকম আলো বা সূর্যালোক ছাড়াই বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পিছনদিকের একটি কক্ষে রক্ষিত আছে বিভিন্ন জাতির পতাকা, যা ফরাসীরা জয় করেছিল নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে। মন্দিরের আর এক কোণে নেপোলিয়ানের প্রথমা স্ত্রী যোশেফাইনের মর্মরমূর্তি।

এরপর আমরা দেখতে পেলাম যুদ্ধস্মৃতিস্তম্ভ। এই স্তম্ভের চতুর্দিকে গত দুই মহাযুদ্ধে নিহত ফরাসী সৈন্যদের নাম খোদাই করা আছে। একপাশে প্রথম মহাযুদ্ধবিরতির তারিখ আর অপর পার্শ্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। মাঝখানে গ্যাস বার্নার-এর সাহায্যে অনবরত উর্ধমুখী অগ্নিশিখা স্মরণ করছে সেই শহীদদের। মাঝে মাঝে জীবন্ত কেউ এসে ফুলের মালা দিয়েও বরণ করছে এদের।

Pantheon ফরাসী জাতির বরেণ্যদের সমাধিস্থান। এতে আছে ভিক্টর হিউগো, এমিল জোলা প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি। প্রবেশপথের উপরিভাগে ফরাসী ভাষায় লেখা আছে 'ফ্রান্স তার জাতির বরেণ্যদের প্রতি কৃতজ্ঞ—'

বিশ্ববিখ্যাত নোত্রদাম গীর্জা গথিক' শিল্পের নিদর্শন। নোত্র দাম এবং সেণ্ট ম্যাগডেলিন উভয় গির্জাতেই কয়েকটি গোলাপ-জানালা

অর্থাৎ গোলাপের পাপড়ির আকারে আঁকা কাঁচের জানালা আছে। যুদ্ধের সময় এদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। গীর্জার অভ্যন্তরের শান্ত পরিবেশটি শ্রান্ত পথিকের তৃপ্তিদায়ক।

এফেল টাওয়ার—পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্তম্ভ। আমাদের গাইড বললে Eiffel tower represents Paris more than anything else. রাস্তার একপাশে Eiffel tower, আর এক পাশে নয়নলোভন উদ্যান। প্যারীর আশেপাশে যেখানেই একটু ফাঁকা জায়গা আছে সেখানেই অপূর্ব সবুজ ও লোভনীয় ফুলের মেলা। এমন পুষ্পপ্রিয় জাত বোধ হয় আর নেই।

সীন নদীর উপরিস্থিত সেতু পেরিয়ে আমরা রওনা হলাম ভার্সাইর উদ্দেশে। বিশ্ববিখ্যাত চতুর্দশ লুই লুভ নিবাসে থাকা পছন্দ না করায় গড়ে উঠেছে এই ভার্সাই প্রাসাদ। এমন রমণীয় প্রাসাদ গোটা ইউরোপ খুঁজলে আর পাওয়া যাবে না —প্রতিটি কক্ষ অপরূপ সজ্জা, ফ্রান্স-এর বিখ্যাত শিল্পীদের অংকিত নানা চিত্রে সুশোভিত দেয়াল, এমন কি কক্ষের সুশোভন ceiling পর্যন্ত অপূর্ব চিত্রমণ্ডিত। এই চিত্রগুলি বহন করছে নেপোলিয়নের অভিষেক—লুইদের ও তাদের প্রেয়সীদের প্রতিচ্ছবি প্রভৃতি নানা পেন্টিং, সবকিছু মিলিয়ে রাজকীয় জাঁকজমক বহন করছে এই ভার্সাই প্রাসাদ। একটি কক্ষে রক্ষিত আছে সেই টেবিলটি, যাতে সুবিখ্যাত ভার্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য ভার্সাই প্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যান। চারপাশের নানারকম ফুল ও ঘাসের মিনাকরা গালিচার নীচ দিয়ে নেমে গেছে পথ, সেই পথ ধরে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুই পাশে নানাজাতীয় বৃক্ষের সারি—কোনটি উঠেছে সমভূমি থেকে, কোনটি বা নেমে গেছে

অনেক নীচে। তারই নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট একটি স্রোতস্বিনী, ধাপে ধাপে নিম্নাবতরণ করছে তার প্রবাহ। পঞ্চদশ লুইএর কীর্তি এটি। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্নারাতে গণ্ডোলায় চড়ে রাজা বেরুতেন জলবিহারে, তাই প্রয়োজন হয়েছিল এই স্বচ্ছসলিল প্রবাহের। উদ্যানের প্রতিটি বৃক্ষ নাকি টবের উপর স্থাপিত। কারণ সম্রাট দিনের দুই বেলায় বাগানের এক রকম রং পছন্দ করতেন না—তাই, যাতে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বাগানের রং বদলানো যায় এই ব্যবস্থা।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে রাজান্তঃপুরিকাদের থাকবার জন্য ছোট একটি অট্টালিকা—চার পাশের উদ্যানের মনোরম পরিবেশে স্থানটি লোভনীয়। ছোট দোতলা বাড়ী কিন্তু গৃহসজ্জায় ভোর্সাই প্রাসাদের সংগে তুলনীয়। এই প্রাসাদের সর্বশেষ অধিকার ছিল মেরী এন্টিওনেটের—তাঁরই পরিবার ও বন্ধুবর্গের ছবি ও সম্রাট ষোড়শ লুই-এর আবক্ষ প্রতিমূর্তিতে এটি সুশোভিত। বিশেষ করে মেরী এন্টিওনেটের শয্যা, টেবিল, প্রসাধন কক্ষ, দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পেতি-ট্রায়ানন থেকে ফেরার পথে দেখতে পেলাম 'ক্যারেজ মিউজিয়ম' অর্থাৎ সম্রাটদের শকটশালা। লুইদের কয়েকটি যানের সংগে রক্ষিত হয়েছে নেপোলিয়নের ব্যবহৃত দুটি কারুকার্যখচিত অশ্বযান। একটি ব্যবহৃত হয়েছিল নেপোলিয়নের প্রথমা পত্নী যোশেফাইনের বিবাহে, আর একটি দ্বিতীয় পত্নীর জন্য। সম্রাটমহিষী অপেক্ষাও জাঁকজমক ছিল সম্রাট প্রেয়সীদের। তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও স্থান পেয়েছে প্রাসাদের অভ্যন্তরে, বাইরে, সর্বত্র।

ভোর্সাই প্রাসাদ থেকে ফেরবার পথে মনে হ'ল, ফরাসী সম্রাটরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করেছেন। নিজেদের দৃষ্টিভংগি থেকে

জীবনের যে অর্ঘ তাঁরা করেছিলেন তার মূল্য অবশ্য দিতে হয়েছিল শেষ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে। ফরাসী রাজ্যের জনগণ যখন দুর্দশার চরম সীমায় পৌছেছিল তখনও মেরী এন্টিওনেট তাঁর প্রাসাদে বিভোর হয়ে চর্চা করেছেন শিল্পকলার। প্রজার হিতে বা স্বার্থে তাঁরা কি করেছেন সে বিচার না করে একথা বলা যায়—তাঁদের প্রচেষ্টায় যা গড়ে উঠেছে তা আজ পৃথিবীর দর্শনীয় হয়ে আছে। ফরাসী রাজ্যের অতীত বিলাসের কিছু উপকরণ ও নিদর্শন আছে এই প্রাসাদে, যা বিংশ শতাব্দীতে অনাবশ্যক হলেও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

পথহারা ফ্রান্স

সেপ্টেম্বরের ফ্রান্স আর এপ্রিলের সুরুতে ফ্রান্সে আকাশ পাতাল তফাৎ। হোটেলে এসে জায়গা নিয়েছি ; সন্ধান দিলে প্যারীর নাইট-ক্লাবের। এজিনিসের আকর্ষণে নাকি পৃথিবীশুদ্ধ লোক ছুটে আসে এখানে। ভ্রমণ-কোম্পানীর কাছ থেকে টিকিট নিয়ে বিকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম পরিচিত জায়গাগুলো আর একবার দেখার জন্য। লুভ মিউজিয়মের আনাচে কানাচে, ইতোয়ালের আশে পাশে, ইফেল টাওয়ারের সামনে বেড়িয়ে সময়টা কাটিয়েছি যাতে রাত ন'টায় ভ্রমণ-কোম্পানীতে আবার যেতে পারি। অল্প সময়ে ফ্রান্সের বিলাস-রাজ্যের জ্ঞান দান করার জন্য প্রতি স্তরের একটি করে নাইটক্লাবে নিয়ে যাবে আমাদের পথপ্রদর্শক। কৌতূহল থাকলেও, আমি মেয়ে, ও 'রাত্রির রাজ্য' সম্বন্ধে আমার মোহ বা লোভ থাকবার কথা নয়। ওরা দেখাবে—প্রথমে শ্রমজীবীদের আস্তানা। মাটির তলায় কয়েক হাত লম্বা-চওড়া ৫ ফিট উঁচু একটি কুঠরীর মধ্যে মনের আনন্দে গানবাজনা করে

চলেছে খেটেখাওয়া মানুষের দল। তার মধ্যে থাকে নারী পুরুষ আর শিশু। ধরণটা খানিকটা আমাদের সাঁওতাল নারী-পুরুষের সম্মিলিত নাচগানের মত। নেই তাতে অশ্লীলতার অশোভন ইংগিত, আছে অবশ্য পানীয়ের অপর্যাপ্ত ব্যবহার। তবে ভুললে চলবে না—ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্স আর ইতালীতে,—লোকে জলের বদলে মদ ব্যবহার করে, আর সেজন্যই সেই পানীয়ে এ্যালকোহলের পরিমাণ থাকে একেবারেই নগণ্য। আমাদের দেশের যারা বিদেশে গিয়ে সুরাপান করেও মাতাল হন না, তাঁরা দেশে ফিরে এ সত্যটা ভুলে যান বলেই ঘটে বিপর্যয়। যাক্, এটা হল 'নাইট ক্লাবের' শ্রমিক সুলভ স্তর।

এর পরের ধাপ—এদেরই সমাজের আর এক শ্রেণীর ক্লাব, যেখানে মেয়েরা খেয়াল-খুশীমত হাসিমুখে গান গায় না; গায় মালিকের ইচ্ছামত। আর মালিকও তাই বিদেশী পথিকের কাছ থেকে বেশী আদায় করার জন্য খদ্দেরের ইচ্ছামত তাদের নাচায়।

তারপর আসবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরামখানা। সেখানে সুরুচিসম্পন্ন নাচের সংগে লালসা-উদ্দীপক সাজসজ্জার অভাব হবে না। দর্শক আর পরিবেশকরা মিলেও নাচতে পারে। আর বলতে বাধা নেই নাইট ক্লাবের দর্শকদের মধ্যে অনেকেই সে নাচ আর পরিবেশের লোভে মোটা দর্শনী দিয়ে তাতে প্রবেশ করেন। বছর ১৬ হ'তে আরম্ভ করে ৪০।৪৫ পর্যন্ত যে কোনো বয়সের নারী সেখানে নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করে থাকে। রঙীন পানীয়ের আধার শূন্য হবার পর আবার তারাই পূর্ণ করে দেয়। নগ্নতারও নানা ধরণ আছে, তা একালের সিনেমার দৌলতে আমরা কে না জানি। নাইট ক্লাবের রূপসীরা আর নতুন কি হবে? বরং ছবিতে যা মোহন, বাস্তবে হয়ত তা বিসদৃশ। তবে এরাই মোহময় আলোকরশ্মি নিভে গিয়ে স্বচ্ছ

আলো জ্বললেই বসনাঞ্চলে নগ্নদেহ আবৃত করে পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হয়। জীবিকা অর্জনের অন্য উপায় না পেয়ে এই পথ অবলম্বন করেছে এরা,—মোহমুক্ত চোখে তাকালেই সেটা চোখে পড়ে।

পৃথিবীখ্যাত প্যারী নগরী তার নারীদেহের উপার্জিত অর্থের গৌরবে গর্বিত। অন্য কোন দেশে এইরূপ শিল্পের নামে রূপের ব্যবসা চলে না, আর তাই প্যারীর নাইট ক্লাবের মত রসনাতৃপ্তিকর আলোচনাও আর নেই। বরং আলোচনার বিষয় ছাড়া উচিত নয় বলেও কম বিদেশী 'দর্শনী' দিয়ে গাইড্‌দের দ্বারস্থ হয় না। কেবলমাত্র শিল্পরস পরিবেশন করাই যদি এর উদ্দেশ্য হোত, তা হলে হয়ত এই রূপোপজীবিনীরা স্থান পেত না ঐ সভাগৃহে যেখানে আলো আর পানীয় দিয়ে আবরণ দেওয়া হয়েছে সব সত্যের উপর। আর ঐ মহানগরীও বিলাসের স্রোতে থেকে স্বর্ণ-শিকার না করে মনঃসংযোগ করত দেশের পুনর্গঠনে—শিল্পে, বাণিজ্যে, উদ্যোগে-আয়োজনে।

অবশ্য সমৃদ্ধ এবং অভিজাত নাইট ক্লাবে, প্রথমশ্রেণীর সুন্দরীদের নগ্নদেহের অপরূপ প্রদর্শনীও প্যারিসে খোলা আছে। সে নৈশ-বিলাসের নানা খবর ও ছবিই সিনেমার প্রসাদে বরং দুনিয়ায় সুপরিচিত, তার জন্য বিশেষ করে প্যারিসের নাইট ক্লাবে দেখা প্রয়োজন কিনা জানি না। শিল্পী নাকি এতে পান সৃষ্টির খোরাক; অ-শিল্পীর কাছেও ধরা দেয় তার কাম্য বস্তু। জানতাম—সাধারণ ভ্রাম্যমানরা কিন্তু এর মধ্যে খুঁজে পাবেন না প্যারীকে। আমাদের চোখে সব বিদেশীর চেহারা এক হলেও বাংগালীর চোখে মুখে যে কমনীয়তা দেখা যায় তার যেন খানিকটা আভাস পাই ফ্রান্সের ভদ্র সমাজের কাছে। বন্ধুবরের কাছে শোনা ছিল মার্কিন পথিকের প্যারীর সমাজে পরিচিতি লাভের কাহিনীটা। পথপ্রদর্শক তাকে

যখন বললে—Here are the Parisians, পথিক চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "But they are all my countrymen, where are the rest ?" প্যারিসে এসে আমেরিকানদের দেখে আমারই বা কি হবে ?

প্যারীর এই যে বিলাসিনী রূপ, সে রূপটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে রূপটাই তার সব নয়, এমন কি সে রূপটা তার নিজেরই নয়—বরং ইউরোপের বিলাসোপজীবিনী নারী ও মার্কিনদেশের ব্যসনলোলুপ ধনিক, ধনিকাদেরই তা সৃষ্টি। তবে প্যারীর আধারে ছাড়া তা হয়ত এই বিশেষ আকার গ্রহণ করত না। কিন্তু এর চেয়ে প্যারীর সত্যরূপ হচ্ছে তার বুলভার, তার কাফে-রেস্তোরাঁ, তার দেশবিদেশের শিল্প-শিক্ষার্থীদের ভালোমন্দ-মেশানো শিল্পানুরক্তি ও শিল্পচর্চা, তার চিত্রশালা, তার বিশ্ববিদ্যালয়, তার সীন নদীর পারে পারে পুরনো পুঁথির খোলা দোকান। আর সব থেকে প্যারীর বড় পরিচয়—প্যারিসিয়ানস্—তার জনতা। তা দেখতে গাইড্ লাগে না, চাই মন আর চোখ। তারা ফুর্তি চায়, গান চায়, গল্প চায়, ঢিলে-ঢালা জীবনও বুঝি চায়; কিন্তু তারা বরাবর চায় 'মানুষের অধিকার।' তারা পাগল হতে পারে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে—ব্যারিকেড্ তোলে বিপ্লবের উন্মাদনায়। সে ঝোঁকটা কমে গেলে ব্যারিকেডের চেয়ারগুলো হাতে করে নিয়ে এসে ফুটপাতের রেস্তোরাঁয় বসে কফি খায়। না কমলে রাজা-রাজড়ার শিরচ্ছেদ করে, 'কম্যুন' গঠন করে, মুক্তির নেশায় প্রাণ দেয়। এই প্যারিসের জনতার ঐতিহ্য ম্লান হয়নি এখনো, এতকালেও, অথচ প্যারিস আর সে প্যারিস নেই—ফ্রান্সও নেই সেই ফ্রান্স—এটাও সত্যি কথা।

"সভ্যতার সংকট" আমরা দেখি দূর থেকে; তার মর্মকথা বুঝি

রবীন্দ্রনাথের মনের আলোকে। কিন্তু "পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট" ফ্রান্সকে ভুগতে হয় বুকের রক্ত দিয়ে। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে যা বোঝায় তার আধুনিক রূপটার নির্মাণে প্রথম নেতৃত্ব করেছে ইংল্যাণ্ড। ইংরেজ বণিকেরা ব্যবসা বাণিজ্য গড়ল, কলকারখানার যুগ নিয়ে এল, এমন কি পরদেশ লুণ্ঠন করে তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করল পৃথিবীজোড়া—যে সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হোতো না। এ বিষয়ে ফ্রান্স তার দোসর হলেও মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর দোসর। ফ্রান্সের ব্যবসায়ী শ্রেণীর অত ব্যবসাবাণিজ্য নেই, অত কলকারখানা নেই, তাদের সাম্রাজ্যও অত বড় নয়। অবশ্য লোভটা তাদের তা'বলে কম নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বৈষয়িক উদ্যোগের সংগে আর একটা জিনিস আছে—যা এই সভ্যতার শিরোভূষণ, অথবা তাকেই বলা উচিত তার লাবণ্য—সে হল পাশ্চাত্য সভ্যতার ললিতকলার দিক।

ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্স ত দ্বীপ নয়, সে ইউরোপের অংগ। তখনো জার্মানী ছিল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, ইতালী ছিল পরাধীন, এই আধুনিক যুগের সেই প্রাক্-ক্ষণে ও প্রথম সূচনায় ফ্রান্সই ছিল তাই ইউরোপের রাজ্ঞী। সেখানেই রচিত হয় ইউরোপের পাশ্চাত্য সভ্যতার চারু-শিল্পের কলাকেন্দ্র, শিষ্টাচার, বৈদগ্ধ্যের বেদী। প্রায় দু'শ বৎসর ফ্রান্স রয়েছে এই ইউরোপীয় সংস্কৃতির রাজধানী। ফরাসীগণ যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবমুখী, বুদ্ধিতে বৈদগ্ধ্যে ঝকমক করে—এসব কথা আমাদের দেশের ফরাসী-প্রেমিকদের কাছেও শুনেছি। আমাদের 'বাঙাল বন্ধু' বলেন—প্রত্যেক বাঙালীর আছে দুটি জন্মস্থান—একটি যেখানে সে জন্মায়, আর একটি কলকাতা। কথাটা তিনি বলেন প্যারিসের কথা উল্লেখ করে 'Every European has two homes—one his own, the other Paris'.

এই ফ্রান্স ও প্যারিসের মানুষ অনেককাল জানত—La Gloire, মানে 'বিজয়গরিমা'র জন্য সব দেওয়া যায়। তাঁদের এই কথাটা শিখিয়েছিল তাদের রাজারাজড়া, সেনাপতিরা। এই শিক্ষা তাদের ভুলতে বাধ্য করেছে যে, সব রাজারাজড়ার চেয়েও অনেক বেশী দুর্ধর্ষ জার্মান রাজারাজড়া ও সেনাপতিরা। ১৮৭০এ প্রথম, তারপর ১৯১৪, তারপর এবার ১৯৪১—তিন তিনবার মার খেয়ে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ এখন আর La Gloire এর স্বপ্ন দেখে না; দেখে জার্মান বিভীষিকার স্বপ্ন। আর ফরাসী মুনিবেরাও এখন আর 'বিজয়গরিমার' কথা ভাবে না, ভাবে সম্পত্তি রক্ষার কথা। সম্পত্তি ত কম নয়—দেশেও আছে, বিদেশেও সাম্রাজ্য আছে। আবার দুইখানেই আছে সাধারণ মানুষের এই বিত্তবানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কারণ ফ্রান্সের মাত্র দুইশত পরিবার এই সম্পত্তির অধিকারী। পৌনে তিনকোটি মানুষের দেশ ফ্রান্স যেমন দরিদ্র, তেমনি বঞ্চিত। এই দুইশত পরিবার তাই 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' নীতি অনুসরণ করেন,—নিজেকে বাঁচাতে হবে দেশের মানুষের থেকেও, সাম্রাজ্যের প্রজাদের থেকেও। তাঁদের আত্মরক্ষার কৌশল হল—'অর্ধং ত্যজন্তি পণ্ডিতাঃ'। অর্ধং দেওয়া যাক্ রক্ষাকর্তা হিসাবে নাৎসী শাসকদের কিংবা মার্কিন মালিকদের, তবু যদি মূলের অর্ধেক বাঁচে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কারণ বলেছি, সাম্রাজ্যের লোক স্বাধীন হতে চায় এবং ফ্রান্সের সাধারণ মানুষও ভালবাসে তাদের La Patrie, পিতৃভূমি। আর প্যারিসের জনতার কথা ত জানাই আছে,—তারা নাৎসীদের বন্ধুদের তাড়ায়, ব্যারিকেড্ তোলে, শপথ নেয়, 'মানব না, মানব না এ বন্ধনে।'

ফ্রান্সের সংস্কৃতিতে দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে এখন এই সংকট। পুরনো

আশা ঐতিহ্যে তাদের আস্থা নেই। তাদের দম গিয়েছে ফুরিয়ে। আস্থা নেই নিজের উপর, আস্থা নেই দেশের মানুষের উপর। তারা তাই মার্কিনী সভ্যতার সুরাসঞ্জীবনীতেই আসক্ত। আর যারা পুরনো আশা-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, তারা আস্থা খোঁজে দেশের মানুষে, পৃথিবীর মানুষে; আস্থা রাখতে চায় নিজেদের শক্তিতেও। মনে হয় ফরাসী কালচারের জগতও দুটো পক্ষে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে—হয় তুমি প্রগতিবাদী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং জনশক্তিতে বিশ্বাসী; আর না হয় তুমি সাম্যবাদবিরোধী, মার্কিনী জীবনপদ্ধতিতে বিশ্বাসী, জীবনে নিরাশা ও যুক্তিহীনতা, উদ্দেশ্যহীনতা, জীবনবিমুখতা, যৌন-উৎকটতা, বিকৃতি ও বিভীষিকাতে মুগ্ধ বা মূর্চ্ছিত।

ফরাসী সংস্কৃতির কিই বা জানি? তবু ফ্রান্সে থাকতে শুনেছিলাম —সে ক্ষেত্রেও যুদ্ধ চলছে। বিজ্ঞানী জুলিও কুরী প্রভৃতি অনেকে কমিউনিস্ট; কবি পল এলুয়ার কমিউনিস্ট; কবি আরাগঁ ত নামজাদা কমিউনিস্ট নেতা। পিকাসোর মত শিল্পীরা কমিউনিস্ট। ফুরজিকে চিত্রকলায় বাস্তববাদ গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে হৈ চৈ। বাস্তববাদী? ছিঃ ছিঃ। এদিকে বৎসরখানেক আগে জেনেভায় শিল্পীদের যে 'আন্তর্জাতিক মিলনীতে' ঝাঁ লুরস্যাঁ ছিলেন দক্ষিণ-মার্গীদের মুখপাত্র, তিনি বললেন—'সোজা কথা বলছি—শিল্পের মূল্য হচ্ছে যত টাকায় তা বিক্রী হয় তাই'। দক্ষিণা যারা দিতে পারে তারা তাই দক্ষিণ-মার্গী, তারাই ফরাসী শিল্পী-সাহিত্যিকের মুনিব—ধার জুগিয়ে, জিনিস জুগিয়ে। মার্কিন মহাজনের প্রীত্যর্থে ফরাসীরা এখন তাই ইংরেজী শিখছে—শিখছে English Language নয়, American Slanguage। মার্কিন ধার থেকে কাগজ পাবে, তারা তাই অনুবাদ করছে তেমনি মার্কিন দেহ-সাহিত্য,

যাতে আছে কড়া উত্তেজনা ও চড়া উৎকটতা। ধার আর কাঁচা ফিল্ম পেতে হবে, তাই ফ্রান্সের সিনেমায় মার্কিনী মালিকানা কায়েম হয়েছে প্রায় দশ আনা। থিয়েটারে মহাজনদের চাহিদামত না হলে নাটক অভিনয় হবে না, অতএব নাটক লেখো সেই মার্কিনী মেজাজে। বড় বড় প্রকাশক, যেমন 'লা লিব্রেই'র প্লোঁ। স্পষ্ট বলেন নতুন লেখকদের, "একটা সোভিয়েট বিরোধী গল্প টল্প কিছু লেখো, ছাপছি। সত্য-মিথ্যা যায় আসে না।"

ফরাসী কাব্য-নাটকের থেকেও ফরাসী উপন্যাসের কদর বরাবরই বেশী। বালজাক্, স্তাঁদাল আমাদেরও শোনা নাম। যদিও আমরা বেশী পড়ি ফ্লবেয়ার, হুগো আর আনাতোল ফ্রাঁস। এখন প্রুস্তও পড়েছি, পড়ে ভাবি—অদ্ভুত আর জঘন্য। কিন্তু ফরাসী নভেল এই অবক্ষয়ের পথে আর এগোবে কোথায়?—সেই পথেই তবু পাক খাচ্ছেন সার্ত্রে; তাঁরই এখন ফ্রান্সে জোর নাম। আর ফ্রান্স কেন, সমস্ত ইউরোপে তিনি যুদ্ধের পর নাম করে ফেলেছেন। তাঁর Existentialism নামে মতবাদের গুণগান (না বুঝেই) আমাদের দেশের কাগজেও চিড়বিড়িয়ে ফুটছে। * মরিয়াকের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ফরাসী যুক্তিবাদী সাহিত্যে তাঁর অনাস্থা মোটেই আশ্চর্য নয়—কারণ তিনি ক্যাথলিকদেরই প্রচারক। এটা অবশ্য একালের ইউরোপেরই একটা রেওয়াজ। ইংরেজ কবি টি, এস, এলিয়ট-এর কথা ত আমরা জানি। ইউরোপে ক্যথলিকবাদের এখন অনেক নূতন চেলা

* এ বই যখন ছাপা হচ্ছে তখন দেখলাম সার্ত্রে তার ভক্ত কেমুসের সংগে ঝগড়া করছেন—'শান্তি আন্দোলন' সার্ত্রে চান, তিনি বিশ্বাস করেন না সোভিয়েট তাদের শত্রু। ভালো কথা, তবে ফ্রান্সের বুদ্ধিমান মানুষেরও বিভ্রান্তির শেষ নেই—এটাই মনে হয় এসব দেখে।

জুটেছে। মানুষ যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন মানুষ গুরু চায়, ইউরোপের সেই গুরু হলেন পোপ—জমাটবাঁধা মোহান্তপরম্পরায় তিনিই মহা-মোহান্ত। ক্যাথলিক চার্চ পশ্চিমের সেই 'অচলায়তন'। ইতালি, ফ্রান্স হল ক্যাথলিক চার্চের খাস-রাজ্য। কিন্তু ফ্রান্সের আসল মন নাকি যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী এবং এ্যন্টি-ক্লেরিক অর্থাৎ পুরোহিত-পাদ্রী বিরোধী। দার্শনিক দেকার্তে নাকি এই যুক্তিবাদী ফ্রান্সের পথপ্রদর্শক।

এই ফরাসী ঐতিহ্য নিয়ে এখন একমাত্র যুদ্ধ করে যারা তারা হল ফরাসী দেশের ওসব কমিউনিস্ট শিল্পী, লেখক ও বৈজ্ঞানিক। অবশ্য অন্যেরা বলছে, "ওরা আবার ফরাসী কি? ওরা ত সোভিয়েট দেশের চর"। কিন্তু মুসকিল এই যে, নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে 'লা পাত্রির' জন্য প্রাণ দিয়েছে এই কমিউনিস্ট ফরাসীরাই বেশী। অন্য অনেক বড় বড় মহারথীর তখন দেখাই ছিল না আর অনেকেই ছিলেন নাৎসীদেরই সহায়ক। কমিউনিস্ট ছাড়া সেদিন যারা দেশের জন্য দাঁড়িয়েছিল তারা কেউ কেউ এখনও তাই স্বাধীনভাবে প্রগতির পক্ষে, যেমন ভেরকর। আর কেউ গিয়ে যোগ দিয়েছেন দ্য গল্-এর দলে—যেমন ঔপন্যাসিক মালরো;—তাঁরা ফরাসী-সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেও গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী—একনায়কত্বের এ্যাডভোকেট। বোধ হয় এরাই একালে সেই La Glorie এর স্মৃতিজীবী দল। মার্কিন মালিকেরা তাই তাদের বাড়তে দিলেও পুরোপুরি দড়ি ছেড়ে দিচ্ছে না। তার চেয়ে হয়ত সোশ্যালিস্টরাই মার্কিনদের বেশী কাজ দেবে।

'এত ভঙ্গ ফরাসীদেশ তবু রঙ্গভরা'—পরিহাসের কথা নয়। শুনলাম যুদ্ধের পর সোবিয়েত দেশ ছাড়া ইউরোপে যদি কোনো দেশে কিছু শিল্পসংস্কৃতিতে নূতন সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা ইংল্যাণ্ডে তেমন হয়নি, জার্মানিতেও তেমন হয়নি, ইতালিতেও হয়নি,

হচ্ছে নাকি এই ফ্রান্সেই। আর ওই কাজে একদিকে আছেন সার্ত্রে, কেমুস প্রভৃতিরা আর একদিকে নাকি কবি পল এল্যুয়ার, লুই আরাগঁ, কথাশিল্পী স্তিল প্রভৃতি কমিউনিস্টরা! শিল্পকলার ত কথাই নেই—অসংখ্য 'নূতন কিছু করো'র রাজ্য সেটা। অজস্র সৃষ্টির মধ্যেও নাকি তবু কমিউনিস্ট শিল্পীদেরই দান অগ্রগণ্য। অবশ্য একটা কথা পরিষ্কার—এঁরা যে ফরাসী ঐতিহ্য গ্রহণ করেছেন, সেই ঐতিহ্য সেই পুরনো শাসকগোষ্ঠীর পথধরা ঐতিহ্য নয়, এঁরা পুরণো ঐতিহ্যে দিচ্ছেন নতুন প্রাণ—অর্থাৎ জনতার জীবনের সংগে করতে চান তাকে যুক্ত। সেই শাসকঐতিহ্য অবশ্য ফ্রান্সে আজ কোথাও নেই। এখনকার শাসক ঐতিহ্য হচ্ছে মার্কিন শাসকঐতিহ্য—ফরাসী শাসকঐতিহ্য তা নয়। এর সংগে তার মিল আছে, অমিল ততোধিক।

ফ্রান্সের তাই 'সেদিন' নেই। প্যারিস দেখেও তা মনে হয় যারা প্যারিসকে জানেন। আর প্যারিসের সাংস্কৃতিক জীবন দেখেও নাকি তা মনে হয় যারা সেই সংস্কৃতিকে চেনেন। আমরা? আমরা টুরিস্টরা বাইরে থেকে যাই, গিয়ে দেখি তার চিত্রশালা, তার হর্ম্যরাজি, আর তারপর দেখি তার—নাইট ক্লাব। দেখি ইউরোপের, আমেরিকার নোঙর-ছেঁড়া বিলাস-ব্যসন-জীবীদের আর ভাবি—এই ফ্রান্স!

কিন্তু যদি আলোচনা করি ফ্রান্সের ভিতরকার অবস্থা তাহলে অনেকেই হয়ত চমকে উঠবেন। পশ্চিম-ইউরোপের সর্ববৃহৎ দেশ এই ফ্রান্স, প্যারী দেখে এর বিচার চলে না। রাজনৈতিক পটভূমিকা আর মন্ত্রীসভার পতনের বহুবার-পড়া গল্প বাদ দিয়েও আছে এর আর একটা সত্যিকার রূপ। এই ফ্রান্সেরই দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে নাকি নেই রাস্তাঘাট, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ার কথা কল্পনা করতেও পারে না, রাস্তাঘাট দুরধিগম্য, ফলে পাণ্ডববর্জিত,—

কল্পনা করা যায় কি এ কথা? প্রদীপের নীচেই যেমন থাকে অন্ধকার, তেমনি এই ফরাসী লেখক আর শিল্পীর সংগেই মনে পড়ে, ফ্রান্সের সেই সব সাধারণ নরনারীকে যারা একটুখানি পড়াশোনা করার লোভে হয়ত অনেকদিনের চেষ্টায় কোনো ভ্রাম্যমানা শিক্ষয়িত্রীকে আমন্ত্রণ জানান তাদের গ্রামে আসতে। তিনি যখন জন্তুবাহী গাড়ীতে চড়ে—কিছুটা পায়ে হেঁটে—বেশ কিছুদিনের চেষ্টায় সেখানে গিয়ে পৌছে পাঠশালা পত্তন করে বসেন, ততদিনে তাঁর উপর নির্দেশ আসে অন্যত্র বদলী হবার। গোটা দক্ষিণ ফ্রান্সে একটির বেশী মোটর গাড়ী যাবার মত রাস্তা নেই। শোনা যায় অনেকগুলি গ্রামের লোকেই রেলগাড়ী চড়ে না, পোস্টাফিস ব্যবহার করে না, ব্যাঙ্কে টাকা রাখে না—ফলে সরকারকে কোন রকম খাজনা তাদের দিতে হয় না। আর টাকা পয়সা তাদের যা জমে (অবশ্য কতটা জমে তা বিচারসাপেক্ষ) মাটিতে পুঁতে রাখে, ফলে খাজনার দায়ে বাড়ী নীলাম হলেও নীলামের খরচাটা উঠে আসে না। আমাদের যেমন স্ত্রী-কন্যার গহনার পরিমাপে পিতাপতির আর্থিক সংগতির পরিমাণ, ফরাসী গ্রামাঞ্চলে তেমনি ঘাঘরার সংখ্যাধিক্যের উপর পরিবারের আর্থিক অবস্থাটা নির্ভর করে। ফলে এই ফ্রান্সের অনেক মেয়েকেই ঘাঘরার স্ফীতি উৎপাদনে কৃত্রিমতার সহায়তা নিতে হয়; নাহলে পতি-সন্ধানে কিছু বিলম্ব ঘটে। ও-বস্তুটা দুই যুদ্ধের পরে ইউরোপে এমনিতেই দুর্লভ।

নানাপ্রকার মদ উৎপাদনই ফ্রান্সের প্রধান উপজীবিকা। আর আছে লেস। ফরাসী লেসের কদর করেন না, আধুনিক জগতে এরকম লোকের সংখ্যা খুব বেশী নেই। আর একটা জিনিস লোভনীয় ইংরেজ বা সাধারণ ইউরোপীয়ের কাছে, সেটি হল ফরাসী খাদ্য। রাঁধুনির নৈপুণ্যে অতি সাধারণ উপাদানও হয়ে উঠে অমৃত। আর

খাবার জিনিসের সত্যিই অবধি নেই ; যেটা অভাব—সেটা সাধারণ লোকের পয়সার। পোষাকের উপর ঝোল না ফেলে ঝিনুক খাওয়াটা সেখানে একটা আর্ট—আর কোন কোন অঞ্চলে অক্টোপাশ, শামুক ; গুগলি প্রভৃতিও বেশ রুচির সংগেই খাওয়া হয়ে থাকে।

এই যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক আর কৃষ্টিগত সংকট দেখা দিয়েছে আজকের ফরাসীদেশে তার, মূল-অনুসন্ধানীরা প্রয়োজন মত তার দাওয়াইও বার করছেন। গত ২০০ বছর ধরে প্রতি ত্রিশবছর অন্তর, জার্মানী একবার করে ফ্রান্স আক্রমণ করেছে আর ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স এগিয়ে চলেছে অবনতির দিকে। এবং এই অবনতি শুরু হয়েছে কবে থেকে ? ১৭৯৩, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে। অতএব সমস্যার সমাধানও খুব সোজা। জার্মান রাজরাজড়া সৈন্য সেনাপতির চেয়েও দুর্ধর্ষ এক রাজার হাতে ছেড়ে দাও ফ্রান্সের রাজতক্ত, ফ্রান্সের পুরোন দিন ফিরে পেতে সময় লাগবে না মোটেই। জব্দ হবে তা হলে জার্মানী, জব্দ হবে শান্তির পূজারী, বাস্তববাদের ধারক। ফ্রান্সের শিল্পীর দল। অর্থাৎ ফিরে যাও মধ্যযুগে, রাজতন্ত্রে ও পোপের ধর্মরাজ্যে। আর যদি রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে না পার, তাহলে আর বেশী দিন নয়, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হতে ফ্রান্সের তর সইবে না। এই যুগসন্ধিক্ষণে যদি ঠিক পথটি বাছতে না পার, পরে আর আফশোষের সীমা থাকবে না। কমিউনিস্টরা ফরাসী জনতাকে বাঁচাবে বটে, ধ্বংস করবে তার ক্যাথলিক ঐতিহ্য, তার শাসক শিল্পকলা, আদবকায়দা, আর ধ্বংস করবে তার বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ—জগদ্বিখ্যাত নাইট ক্লাব। তারপরে ফ্রান্স থাক্‌লেই বা কি না থাক্‌লেই বা কি ?

পথিক স্বর্গ

সুইজারল্যাণ্ড

এগিয়ে এল ইস্টারের ছুটি। অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রওয়ানা হলাম ইউরোপের উদ্দেশ্যে। ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়া 'ভূস্বর্গ সুইজারল্যাণ্ড' ভেসে উঠল চোখের সামনে, যখন শুনলাম টুরিস্ট কোম্পানী সব ব্যবস্থাই ঠিক করে ফেলেছে। ইস্টারের তুষারপাত উপেক্ষা করে রওয়ানা হলাম দূর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। টুরিস্টদের পক্ষে সময়টা অসুবিধাজনক হলেও ইংল্যাণ্ড প্রবাসীর পক্ষে এতেই মুক্তির আস্বাদ।

প্যারী থেকে যখন সুজারল্যাণ্ডের ট্রেন ধরলাম রাত তখন দশটা। নিজের বার্থটি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হল না। পোর্টারএর সহায়তায় বিছানাপত্র গুছিয়ে ডাইরীখানা নিয়ে যখন বসলাম পাশেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ৩১২নং বার্থটা কি এ কামরায়? সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই ভদ্রলোক তাঁর হাতব্যাগ আর সুটকেশটি নামিয়ে প্রবেশ করলেন আমারই পাশের বার্থে। দুটি বার্থের মাঝে মাত্র একহাত ব্যবধান। এখানেই রাত্রিবাস। তাকালাম উপর দিকে, দোতলার বার্থএ পাশাপাশি দুই ভদ্রমহিলা আর তিন তলায় দুটি ভদ্রলোক। কারো সংগে বার্থ বদলাবার বৃথা দুরাশা আর পোষণ না করে শুয়ে পড়লাম ভাবতে ভাবতে, কতখানি বিশ্বাস আর ভদ্রতাজ্ঞান মেদে-মজ্জায় বসে গেলে বিনা দ্বিধায় এভাবে চলাফেরা করা যায়। আমাদের দেশে অবশ্য এত অসংকোচ শীঘ্র গড়ে উঠ্‌বে না। কিন্তু চলাফেরা যখন এ যুগে করতেই হবে তখন তা যত শীঘ্র গড়ে ওঠে ততই মঙ্গল।

পরদিন ভোরবেলা ট্রেন বদলিয়ে যখন এগোলাম লুগানোর দিকে পথে পেলাম কয়েকটা বিরাট ট্যানেল। তার একটা প্রায় দশ মাইল লম্বা, নাম তার সেণ্ট গথহার্ড। তার এপারে লুসার্ন আর লোজানো আর ওপারে লুগানো। এপারে ঝকমকে সূর্যকিরণ, ওপারে লুগানোতে নেমেছে চেরাপুঞ্জির বর্ষা। এপারে পাহাড়-চূড়ায় জমেছে বরফ, সেই বরফ গলে জল হয়ে ঝরণারূপে বেরিয়ে এসে পড়ছে ওপারে লেকের বুকে আর তাদেরই বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে, সুইজারল্যাণ্ডের নদী আর নদ। রাস্তা উঠেছে ঘুরে ঘুরে, একই গীর্জা আঙুল দিয়ে তিনবার দেখালেন সহযাত্রিনী। গাড়ী নেমে এল লুগানো স্টেশনে—বিদেশিনীর শাড়ির প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা না দেখিয়ে সুইস্ প্রকৃতি দেবী শুরু করলেন প্রচণ্ড বর্ষণ। ভাবছি এ অপরিচিত জায়গায় হোটেল খুঁজে বার করব কি করে? এমন সময় একটি বেয়ারা জাতীয় লোক নাম ধরে ডাকতেই বুঝলাম আমার হোটেলের কেউ। টুরিস্ট কোম্পানী সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল। হাতে টাকা আর মনে সাহস থাকলে, ইউরোপের সর্বত্র বোধ হয় নির্ঝঞ্ঝাটে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে একা ঘুরে বেড়াতে পারে।

সুইস্ আতিথেয়তার নিদর্শন মেলে এই হোটেলটিতে। ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এটি লোভনীয় জায়গা। দামে সস্তা অথচ পরিবেশটি মনোরম। হোটেলের মালিক আর যাত্রীর সহৃদয় ব্যবহারের কথা ভুলব না কোন-দিন। আমি অন্য কোন ভাষা জানি না বলে তাদের ইংরাজী বলবার কি আপ্রাণ চেষ্টা। আর তাদের সহানুভূতি আমার নিঃসঙ্গতাকে করেছিল পরিপূর্ণ। এরাই আমাকে বলেছিল, কি করে আর কোন পথে টুরিস্ট কোম্পানীদের সহায়তা নিতে হয়। তাই যখন লিওনার্দো-দা ভিঞ্চির প্রসংগে আলোচনা চলছিল এরা জিজ্ঞেস করল, তুমি 'লাস্ট

সাপার' দেখেছ? বললাম দেখেছি বই কি? লণ্ডনের রয়্যাল একাডেমীর লিওনার্দো পঞ্চশত বার্ষিকীতে। ওরা বললেন, সেটা নয়; আসলটা। কাল চলে যাও মিলান, সেখানে দেখতে পাবে। গিয়েছিলাম মিলান—সে কথা বলছি। কিন্তু হয়ত না গেলেই ছিল ভাল, বোমা-বিধ্বস্ত মিলানের ঐ গীর্জাটির দেয়ালে অতুল কীর্তি ঐ লিওনার্দোর অমর ছবিটি প্রায় লোপ পেতে বসেছে। অবশ্য সম্প্রতি চেষ্টা চলছে ছবিটির সংস্কারের, কিন্তু তার ফলে কি দাঁড়াবে কে জানে?

সেণ্ট মরিৎস্

ইউরোপের তুষারপাত দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম লুগানো থেকে সেণ্টমরিৎস্-এর পথে। আল্‌পসের এই পাহাড়-চূড়াটি যদিও সর্বোচ্চ নয়, তথাপি তার সৌন্দর্য আর স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের জন্য প্রতি গ্রীষ্মের শুরুতে এখানে স্বাস্থ্যকামী সৌন্দর্যপিয়াসীদের সমাগম হয়। পথিকদের কাছ থেকে সুইজারল্যাণ্ড বার্ষিক যে দশলক্ষ পাউণ্ড আদায় করে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশই আসে এই সেণ্টমরিৎস-এর কল্যাণে। স্বর্গধামের এই হল ইন্দ্রলোক—এর নামে একবার অন্তত যাবার লোভ হয় না ইউরোপে, এমন লোকের সংখ্যা বিরল।

পথের শেষ আছে, কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তাই সুইস-সীমান্ত পার হয়ে আমরা চাইলাম ইটালীর সীমানায় প্রবেশ করতে। বাধা দিলেন ইটালীয় সরকার; কারণ উপযুক্ত ছাড়পত্রের অভাব। বার দুয়েক সীমান্ত পার হতে গেলে আমার ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে; সেণ্টমরিৎস অবধি পৌঁছান আর হবে না। কিন্তু উচ্চ ইটালীয় ফাঁপাই মুদ্রা-ব্যবসায়ীর কাছে সুইস মুদ্রার কৌলিন্যের অসীম প্রভাব। গোটা পশ্চিম-ইউরোপে এখন আমেরিকান

ডলারের পরেই সুইস মুদ্রার প্রাধান্য। ভারতের ব্রাহ্মণ্য-যুগের পুরোহিতের ন্যায় আমেরিকান ডলারবাহকের অসীম প্রভাব এই পশ্চিম ভূখণ্ডে। আমেরিকাবাসীর প্রতাপে পাউণ্ড এলাকার অধিবাসীরা ত ইউরোপের চোখে কৃপার পাত্র। এই প্রতাপ অনুভব করেছিলাম মিলানেও সেবার Van Gogh-এর শিল্প প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে। কমনওয়েলথ্ গর্বিনী আমি যেখানে পাউণ্ডের বিনিময়ে ইটালীয় মুদ্রা লীরা পেলাম না, সেখানে আমারই সহযাত্রিনী দুটি আমেরিকান তরুণী ডলার ভাঙ্গিয়ে আমাকেও একখানি প্রবেশপত্র কিনে দিলে। পাউণ্ডের উপর অহেতুক রাগ না দেখিয়ে প্রদর্শনী ভালভাবে উপভোগ করে এলাম। এমন কি, চতুঃশক্তিশাসিত ভিয়েনায়ও যখন ট্রেনের টিকিট বদলে প্লেনের টিকিট চাইলাম, ট্রেভেলিং এজেন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ডলার আছে? নেই? তাহলে কি করে ভাড়া দেবে?' ডলার না থাকায় অগত্যা সেবার কলেজে দেরী করেই ফিরতে হল। এখানে—সুইস্ সীমান্তে—সংগে কিছু সুইস মুদ্রা ছিল বলে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিতে অসুবিধা হল না।

প্রকৃতির অঙ্গে অস্ত্রোপচার করে তৈরি হয়েছে যে সুড়ঙ্গ সেটা পেরিয়ে কোমো লেকের পাশে এসে পড়লাম। প্রকৃতি যেন হেসে উঠলেন তীর্থযাত্রীর পানে চেয়ে। এতক্ষণ আমরা আকাশের চেহারা দেখে ভেবেছিলাম ইংল্যাণ্ডেই এলাম বুঝি আবার। চোখ মেলে তাকালাম:

'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' এ প্রশ্নের জবাব আজ পেলাম। পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়ের কোলে নিস্তব্ধ হ্রদে ইতস্তত ভাসমান ছোট নৌকা। পাহাড়ের মাথায় বরফ পড়ে

ঝকমক করছে প্রকৃতি। তারই গা বেয়ে নেমে আসছে সংকীর্ণ ঝরণাধারা, গড়িয়ে পড়ছে ছোট বরফ-গলা স্রোতস্বিনীর বুকে। সে আবার ছুটে চলেছে মাটিমায়ের আকর্ষণে; ছোট ছোট উপলখণ্ডের বাধাকে অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঐ হ্রদরূপী প্রিয়ের অঙ্কে। এই খেলা চলেছে পৃথিবী জুড়ে :—পর্বতশীর্ষে হিমকণা, ভূগর্ভে সাগরবারি; জাতি এদের একই, একে অন্যের পরিপূরক—কিন্তু কি বৈচিত্র্য!

লুগানো হ্রদের পাশ দিয়ে আমাদের কোচ চলেছে—ধীরে ধীরে আমরা নীচে নামছি। পাহাড় আর তার পাশের বাঁকা রাস্তা দিয়ে সুন্দর তার গতি। এসে নামলাম দুই পর্বতের মধ্যবর্তী প্রশস্ত উপত্যকায়। দু'ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো। এখানে-সেখানে ছিল আঙ্গুরক্ষেত, তার চিহ্ন বিদ্যমান। বসন্তের শেষে গাছে গাছে শুরু হয়েছে মুকুল ধরার পালা; কোনটার রঙ নীলাভ, কোনটা হাল্কা বেগুনী, কোনটা শাদা। আর তাদের শাসন করছে উদ্ধত সিটান, সাইপ্রেস, ওলিভ আর পপলারের দল।

আবার ইটালীর সীমানা। কোমো হ্রদের বুকে পড়েছে তার প্রিয় শৈলের ছায়া। ওরা মুখ দেখছে কোমোর কাক চক্ষুর মত নির্মল নীরে। ভাসছে একটা দুটো ছোট নৌকা। নেই বণিকসুলভ চেঁচামেচি, পরিবেশের রূপ তাদেরও দিয়েছে নিস্তব্ধ করে।

এবার আমরা উঠছি তুষার রাজ্যে। রাস্তার আশে পাশে ছড়ানো হিমকণা। ক্রমশ তুষারে ছেয়ে গেল চারিধার। চারদিকে শুধুই শাদা। রোদের আলো পড়ে তার থেকে প্রতিবিম্ব ঠিকরে পড়ছে, তাকানো ক্রমশ দুষ্কর হয়ে উঠছে। ঐ উঁচু পাহাড়-চুড়া, পাশের ঐ প্রাসাদগুলো—আমাদের ডানদিক ও বাঁদিকে ৮০০০ ফুট নীচে ঐ যে গ্রামের রেখা দেখা যায় সবই যেন মাখন দিয়ে তৈরী। হাত দিলেই গলে

যাবে যে। ঐ চূড়ায় শুভ্র হিমানী ধারণ করেছে ভাস্করের সাতটি রঙ। তারই অদূরে ছোট একখণ্ড মেঘ সোণালী আর গৈরিকবর্ণে সেজে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য। ঐ সাইপ্রেস গাছগুলো ধরে রয়েছে রাশি-রাশি পেঁজা তুলো। একবার একটু হালকা হাওয়া এসে মজা দেখবার জন্য ওদের চুল ধরে একটু নাড়া দিয়ে যাচ্ছে আর গুঁড়ো হয়ে ঝড়ে পড়ছে হীরার কণা। শাখা দুলিয়ে এরা করছে আমাদের অভিবাদন। যতই উপরে উঠছি জমানো বরফের চোখ ঝলসানো রূপ ততই তীব্র হতে তীব্রতর হচ্ছে। পাশে পেলাম ছোট একটি জলধারা—যা অতি কষ্টে নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। আমাদের সুইস পথ প্রদর্শক গর্বভরে বলল, "জান, এই আমাদের নদী। দেখতে মনে হচ্ছে খুব ছোট, আসলে এই কিন্তু অষ্ট্রিয়ার দানিয়ুব আর জার্মানীর 'রাইন'কে জল যোগায়।"

শ্রমপ্রিয় সুইস জাতি পথিকের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে পথের আশেপাশে তৈরি করেছে হোটেল রেস্তোঁরা—চা-খানা আর কফিখানা। তারই ফলে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গ্রাম, স্বাস্থ্যনিবাস আর বসতবাড়ী; কিছুরই অভাব নেই। ক্লান্ত পথিক চা, কফি, সুরা, খাদ্য--যার যাতে রুচি তার সদ্ব্যবহার করে আবার যাত্রা করে শুরু। এখানে সেখানে কর্মরত সুইস ছেলেমেয়ের দল হাত তুলে জানায় সহাস্য অভিনন্দন—ব্যবহার এদের অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ। অতিক্রম করে যাই পাহাড়ের আর এক ধাপ। আর ১০০০ ফুট বাকী। হঠাৎ গাড়ীর গতিবেগ কমে কমে ক্রমশ একেবারেই ক্ষান্ত হয়ে গেল। প্রকৃতি সহ্য করবে না যান্ত্রিক সভ্যতার অত্যাচার; তাই পাঠিয়েছে তুষারস্তূপ আমাদের পথ অবরুদ্ধ করতে। কিন্তু আমরা বিংশ-শতাব্দীর নরনারী, তাই হার মানব না। গাড়ীর চাকায় বেঁধে নিলাম

লোহার শিকল আষ্টেপৃষ্টে। আর সুইস পথরক্ষকেরা যন্ত্রেরই সাহায্যে বরফ পরিষ্কার করে, অতিথিদের যাত্রাপথ করে দিল সুগম। এই অবসরে আমরা ছবি তুললাম। মধু-চন্দ্রিমাযাপনকারী প্রেমিক প্রেমিকারা উপভোগ করে নিলে নীরব প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্য—পরস্পরের দেহে তুষারকীলক ছুঁড়ে তারা অভিবাদন করল সেণ্টমরিৎস উপত্যকাকে। ওদের পাশ হতে সরে গিয়ে চেষ্টা করলাম বরফের উপর গড়িয়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে যাবার জন্যে ; বরফের ঘায়ে একটু রক্তপাত হল মাত্র।

পাঁচ মিনিট চলার পর হোটেলে এসে পৌঁছলাম। সেখানে লাঞ্চ খাওয়ার পর আবার উপরের দিকে উঠতে লাগলাম। ৩০৫৮ মিটার (১০০০০ ফুট) উঁচু এই গিরি-শৃঙ্গের অন্তরালবর্তী উপত্যকা প্রকৃতির মায়াপুরী। কল্পনা এখানে মূক, ভাষা এখানে নীরব। ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে গিয়েছে যে হিম-অচল, তারও দেহে অস্ত্রোপচার করেছে আধুনিক সভ্যতা—বাড়ীগুলো উঠেছে তার অঙ্গ ঘিরে। কিন্তু আজ তারা তুষারে আবৃত। গৃহবাসীর দল আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের নীচে সমতলভূমিতে। ধার্মিক খ্রীস্টানরা এখানে তৈরি করেছে গীর্জা। যীশুখ্রীস্টের শিষ্য সেণ্টমরিৎস-এর নামে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির। দোকান বাজার হোটেল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার যতকিছু অত্যাবশ্যক উপকরণ, সবই এই দশহাজার ফুট উপরে পাওয়া যায়। হেয়ার ড্রেসিং, এমন কি 'নাইলনের' মোজা সারাবার দোকান পর্যন্ত। যারা এখানে বাস করতে আসেন তারা কোনরকম অসুবিধা সহ্য করতে অভ্যস্ত নন। কি করে অতিথিকে স্বাচ্ছন্দ্য আর তৃপ্তি দিতে হয় তা এখানকার লোকেরাও জানে। তাই যে একবার এখানে আসে, আবার সে আসতে চায়। আর্থিক লেনদেনের ভিতর দিয়েও এরা যে আন্তরিকতা

দেখায় তার তুলনা ইংল্যাণ্ডে ত নয়ই, আজকাল আমাদের দেশেও মেলে না। ইদানীং ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে সুইজার-ল্যাণ্ডেরই ক্ষতি বোধহয় হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ওখানে গিয়ে বসবাস করা পাউণ্ড মালিকের অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। ফলে সুইস আতিথেয়তার সংগে অর্থনীতি জড়িত হয়ে যাত্রীদের সংগে ওদের ব্যবহারকে করেছে আরও ভদ্র, আরও আন্তরিকতাপুর্ণ।

সেণ্টমরিৎসের উপর হতে নেমে আসার আয়োজন করছি, হঠাৎ পিঠে আঘাত পেয়ে চমকে তাকালাম উপরের দিকে—বরফে ঢাকা একটি বাড়ীর বারান্দা থেকে সহাস্য একদল শিশু আমাদের বরফের গোলা ছুঁড়ে অভিবাদন করছে। আমরাও চেষ্টা করলাম প্রত্যুত্তর দিতে। কিন্তু সমতলভূমির লোক আমরা পারব কেন ওদের সংগে। রণে ভঙ্গ দিয়ে সহাস্যে আশ্রয় নিলাম "বাসদুর্গে"। চারিপাশের তুষাররাজ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হল, "নবনীত শুভ্র" কথাটির মানে বোধহয় এর আগে এমন করে আর বুঝিনি। মনে হয় হাত দিলেই গলে যাবে—কিন্তু এরা বজ্রের মত কঠোর, বেশী চাপ দিলে গুঁড়ো হয়ে যায়—জল হয় না; এরা ভাঙ্গে তবু মচকায় না। যে কোন মালিন্য এদের কাছে হার মানে। নীল আকাশের কোলে অপুর্ব শুভ্র পর্বতশ্রেণী একের কাঁধের উপর দিয়ে অপরে উঁকি মারছে। পায়ের কাছে পড়ে আছে হেলায় জমে যাওয়া হ্রদের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। উত্তপ্ত তপনএর কাছে মাথা নিচু করে আপনার কিরণ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এই ত ভূস্বর্গ।

নেমে এলাম এই সুরলোক থেকে। পড়ন্ত সুর্যের আলোয় আশী মাইল পথ অতিক্রম করলাম তিন ঘণ্টায়। ঢালু পথে বিশেষ সাবধানে চলতে হয়—না হলে পদে পদে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। ফেরবার পথে

গাইড আমায় জিজ্ঞাসা করল, "কেমন দেখলে আমাদের দেশ ?" আমি বললাম—"চমৎকার।" সে অত্যন্ত গর্বের সংগে আবার বলল, "জানো আমাদের এই দেশে থাকার জন্য, লোকের আগ্রহের আর সীমা নাই। কি সুন্দর আমাদের দেশ।" মজা দেখার জন্য বললাম, "আমার কিন্তু মনে হয় না কেউ এখানে চিরকাল বাস করতে চাইবে। শুধু থাকা আর খাওয়াটাই কি জীবনের সব ?" সে নিতান্ত বিস্মিতভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—এমন কথা সে বোধহয় আর কখনও শোনে নি। তারপর তাচ্ছিল্যভাবে বলল—"কি জানো, ভিন্ন রুচিহি মানবাঃ।" আমি হেসে বললাম, "তা ত বটেই।"—তর্ক জমে উঠেছিল, হঠাৎ এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, "সুইস জাতির দেশের প্রশংসা করলে, এরা তোমার বন্ধু। আর ওদের বিরুদ্ধে কিছু বললে বা সমালোচনা করলে--এরা তোমায় কৃপার চোখে দেখবে।" বিদেশে বন্ধুত্বটা বড়ই মূল্যবান, তাই প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললাম, "দেখেছ ঐ কোমো গ্রামটি কি সুন্দর দেখাচ্ছে!" সূর্যাস্তের রঙ পড়ে আল্পসের বুকে রক্তিম কোমো গ্রাম আমাদের জানাল বিদায় অভিনন্দন। আমার সঙ্গীর মুখও হয়ে উঠল এবার উজ্জ্বল, আমরাও নেমে এলাম আমাদের আবাসে।

সুইস জাতিকে বন্ধু করেই এলাম—এমন সুন্দর দেশের মানুষকে বন্ধুরূপে পেতে পারলে মনে হয়—আরও সুন্দর। এরা আতিথেয়তার ব্যবসার মধ্যে এমন একটা আগ্রহ আর আন্তরিকতা মেশাতে পেরেছে যে সবারই বল্‌তে সাধ হয়—'কি সুন্দর দেশ! আবার যাব সুইজারল্যাণ্ডে।'

সুন্দরী ভেনিস

প্রকৃতি ও মানুষে মিলে তৈরী করেছে আড্রিয়াতিক উপসাগরে পা-ভেজান ভেনিস নগরী। দু'ধারে নদীর মোহানা আর তার উপর দিয়ে মানুষের তৈরী চমৎকার সেতু। তারই উপর দিয়ে যখন প্রবেশ করছিল আমাদের বাষ্পীয়যান চোখের সামনে ভেসে উঠল, চির-যৌবনা কুমারী ভেনিসের প্রতিমূর্তি। বৎসরান্তে একবার আড্রিয়াতিককে একটি করে অংগুরীয়কের বিনিময়ে সে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তার অপরাজেয় কৌমার্য। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যপদেশে 'শকহূন-দল পাঠান মোগল' সবাই এসেছে এর পদপ্রান্তে, আর সে অকৃপণ উদারতায় সবাইকে জুগিয়েছে রসদ পানীয়। উপকারীরা রেখে গেছে তাদের চিহ্ন—মসজিদ গীর্জা আর শিল্পকলায়।

সেণ্ট মার্কস গীর্জা মনে করিয়ে দেয় ভারতীয় মসজিদের কথা। তাই প্রথম দর্শনেই যখন বললাম, এ ত মুসলমান প্রভাবের ফল, গাইড্ অবাক্ হয়ে বলল—"তুমি কি করে জানলে?" "আরে ঐ যে উটের ছবি মোজাইক করে দেয়ালে বসানো হয়েছে, আর ঐ যে দাঁড়িওয়ালা বৃদ্ধ একজনের হাতে কি যেন দিচ্ছে—ঐ ত প্রমাণ।" যুগে যুগে এই মূর্তি আর আশেপাশের কারুকার্যের রদবদল হয়েছে। কিন্তু তার আর্চভূষিত স্থাপত্যের পরিবর্তন কেউই করেনি, আর করতে পারবেও না। সর্বশেষ পরিবর্ধন হয় ১০৯৪ খৃস্টাব্দে। ভিতরটা আর পাঁচটা চার্চেরই মত, হয়ত উনিশ-বিশ হবে। বাইরেটা খুব অভিভূত না করলেও মোজাইকের প্রশংসা করতে হয়। তবে যাঁরা তাজমহল বা অন্য ভালো মুসলমানী শিল্প কলা দেখেছেন তাঁদের কাছে এ ধরণের কাজ একেবারে সাধারণ বলে মনে হবে।

এই সেণ্ট ম্যার্কস গীর্জাকে কেন্দ্র করে ভেনিসের বাজার অফিস সবই। সেণ্ট মার্কস স্কোয়ার-এর চারপাশে এরা অবস্থিত। এক পাশে আছে ক্লক টাওয়ার, যার উচ্চতা তিনশ মিটার। উপরে উঠবার জন্য আছে লিফ্‌ট আর সিঁড়ি। লিফটে উঠলে পয়সা বেশী লাগে আর সিঁড়িতে উঠতে গেলে প্রাণান্ত। প্রতি ঘণ্টায় এর উপরিস্থিত পেটা ঘণ্টায় হাতুড়ির শব্দ হয় আপনা হতে, অর্থাৎ টাওয়ারের ভিতরকার বিরাট ঘড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। ঘণ্টাটির ওজনটা কত বলেছিল ঠিক মনে নেই। তবে সে যে নেহাৎ কম নয় তা তার গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনলেই বুঝা যায়। উপর থেকে নীচের মানুষের চেহারা গালিভার্স ট্রাভেলসের ক্ষুদেদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। চারপাশে ভেনিসের দৃশ্য অপরূপ। গোটা আড্রিয়াতিক উপসাগরের সবটাই যেন ধরা পড়েছে ঐ ভেনিসের আশেপাশে। সাতটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি গগনবিহারীর কাছে তুলে ধরল তার রূপ।

সাগরের জল কেটে খাল তৈরি করে নির্মিত হয়েছে ভেনিসের "রাজপথ", নাম তার "ক্যানেল গ্র্যাণ্ড"। এই রাজপথের সুনীল নীরে গা ভাসিয়ে যাত্রী পারাপার করে ধূম-উদ্গীরণকারী ষ্টীমারসমূহ—এরাই ভেনিসের 'স্টেট বাস'। এই পরিবাহকগুলি মিনিট ঘণ্টা মেপে প্রতিটি স্টেশনে দাঁড়ায়—কোথাও দূরত্ব কুড়ি মিটারের বেশী নয়। যাত্রীর পায়ে চলার ভার এরা অনেকটা লাঘব করে দেয়। খালটি নগরীর বুক চিরে এঁকে বেঁকে যাওয়ার দরুণ সর্বত্রই এর সাহায্যে যাওয়া আসা চলে। এরই দু'পাশের ভাল ভাল বাড়ীগুলিতে বাস করে গেছেন শেলী, ব্রাউনিং, কীটস্। একটি বাড়ীর গায়ে বড় বড় করে লেখা আছে ব্রাউনিংএর দুটো পংক্তি—যার মর্ম :

"আমার হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করে দেখবে,

একটি নাম—ভেনিস।”

লাবণ্যময়ী ভেনাসের মতই এই ভেনিস নগরী মুগ্ধ করেছিল ব্রাউনিংকে। শুধু তিনিই বা কেন, ইংল্যাণ্ডের কোনো কবিই এর সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই অন্তত একবারও এখানে এসে বাস করে গেছেন প্রায় সবাই।

এই সেদিন বেলজিয়ামের রাজাকে তাঁর হবু-কনে দেখান হয়েছিল এই ভেনিসের উপকূলে। ইউরোপীয়দের কাছে মধুচন্দ্রিমা যাপন করার পক্ষে এমন একটি স্থান নাকি আর নেই। “গণ্ডোলা” বা ছোট ছোট নৌকায় ক্যানেলের তীরে তীরে বেড়িয়ে বেড়ানো আর দিনান্তে হোটেল বা রেস্তোঁরায় পানাহারের পর তৈরী শয্যায় দেহ এলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আছে মাধুর্য। দৈনন্দিন জীবন-যুদ্ধ এড়িয়ে কেবল “দোঁহে দোঁহা পানে” চেয়ে কাটাবার পক্ষে লোভনীয় জায়গা এটি। তবে যখন বিশ্বসংসারের দিকে তাকাবার সময় আসে তখনই দেখা যায় ক্যানেলের শাখাগুলির দুর্গন্ধবাহী জলের উপরকার সবুজ শ্যাওলা। দায়িত্বজ্ঞানহীন নরনারীর নিক্ষিপ্ত সংসারের আবর্জনাবাহী সে সরু খালগুলিতে একমাত্র গণ্ডোলা ছাড়া অন্য কোন যান নেই। জোয়ারের সময় ছাড়া এই জলের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়া একমাত্র আত্মভোলার পক্ষেই সম্ভব। তবে সাধারণ ভ্রাম্যমানদের এসব লক্ষ্য করাটা নিশ্চয় অপ্রয়োজনীয়। আমি তাই প্রস্তুত হলাম। পথপ্রদর্শক অর্থাৎ “কুক্স” কোম্পানীর সাহায্যে একটি গণ্ডোলা চড়ে রওয়ানা হলাম—একটি গীর্জা আর বিশ্ববিখ্যাত “ভেনিসিয়ান গ্লাস”-এর কারখানা দেখতে।

গীর্জাটি দেখতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল তার জরাজীর্ণ অবস্থা। কিন্তু এর ভিতরে লুকিয়ে আছে অপরূপ সম্পদ। চিত্রকর টিসিয়ানের

সমাধি এই গীর্জার অভ্যন্তরে। শিল্পীর নিজের হাতে আঁকা ছবির অনুকরণে নিপুণ ভাস্করের হাতে ইটালিয়ান মার্বেলের গা কেটে করা হয়েছে এই বেদীটি। কবরটি অনেকটা পিরামিডের ভঙ্গীতে। কবরের উপরে এক আবরণ, আর সামনে তাঁর রোরুদ্যমানা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের প্রতিমূর্তি। ভেবে পেলাম না প্রশংসা করব কার—চিত্রকরের না ভাস্করের? টিসিয়ানের মত নিপুণ চিত্রকরের কাছে এর নক্‌সাটা খুব অসাধারণ নয়। কিন্তু যে ভাস্কর মসৃণ ইটালিয়ান শ্বেতমর্মরে এঁকে এমন শোকাবহ রূপ দিয়েছেন তাঁর প্রতিভা ম্লান করে দিয়েছে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর কামনাকে। অবশ্য ইটালীয় সমাধির বিশেষত্বই হ'ল শোকাকুল প্রিয় ও প্রিয়াকে মর্মররূপে সমাধিস্থলে বসিয়ে রাখা। মিলান নগরীর সমাধিস্থলেও এরূপ অনেক মূর্তি অথবা দৃশ্যাবলী তৈরী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু টিসিয়ানের বিশ্রামাধারটি যেন একেবারেই প্রাণবন্ত, মনে হয় আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে এরা কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।

গীর্জাটি গথিক ভাস্কর্যের রীতিতে গঠিত। বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে আছেন ডোনাটেলোর তৈরি কাঠের যীশু। সজীব সরলতায় আহ্বান করছেন, জগতের যত পাপীতাপীকে। ধর্মের আড়ালে আত্মপ্রকাশ করছে শিল্পীর নিপুণতা। আর দেয়ালের আর একদিকে আছে বাবলা-গাছের গুঁড়িতে আঁকা বেলিনীর "এসাম্পশন"। শোনা যায় ১৯০৫ সনে জনৈক আমেরিকান ভদ্রলোক এ চিত্রের জন্য ১০,০০,০০০ ডলার পর্যন্ত দাম দিতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু গীর্জার কর্তৃপক্ষ বিক্রয় করেন নি। এর থেকেই খানিকটা আঁচ করা যেতে পারে ছবিটির মর্যাদা। বেলিনীকে বলা হয়ে থাকে—"Master of the Masters", 'গুরুর গুরু'—অর্থাৎ জগতের সেরা নিপুণ চিত্রকরদেরও তিনি গুরু। তাঁরই

আঁকা এ ছবিটি চিত্রবিলাসীদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু। উপাসনার জায়গাটির গা ঘেঁসে আছে কারুকার্য করা কাঠের রেলিং। গাইড পরম কৌতুকের সংগে বলল, "জান—এই রেলিংটি তৈরী হয়েছিল কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ২৫ বৎসর পূর্বে।" অর্থাৎ দেখ আমরা আমেরিকার তুলনায় কত উন্নত। হঠাৎ সে ছুটে গিয়ে একটি পাথরের মূর্তির কোন একটি জায়গায় হাত চাপা দিয়ে বলল, "তোমরা আগে দেখে নাও তারপর আমার হাত তুলব।" আমরা বিস্মিত হয়ে দেখলাম একটি অপূর্ব ইটালীয় নারীমূর্তি। প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁত, নাক মুখ চোখের গঠন, দেহের লাবণ্য, ইটালীয় ভাস্কর্যের গৌরবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এবার ভদ্রলোক হাত তুলে বললেন, "এবার দেখ দেখি মেয়েটির হাত দু'খানা।" সত্যিই দেখে অবাক হতে হয়। এমন সুন্দরী নারীর হাত দু'খানা যে, এরূপ কর্কশ আর কদাকার হতে পারে তা কল্পনা করাই যায় না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম তার মুখের দিকে। কৌতুকচঞ্চল চোখে সে বলল, "দেখছ কি? ইটালীয় রমণীরা খেটে খায়, তাই ভূমধ্যসাগরের আকাশ আর জল তাকে যত রূপই দিক না কেন, শ্রমিক রমণীর হাতে কাঠিন্যের ছাপ পড়বেই। খবরদার ওদের সংগে লাগতে যেও না বেশী সুবিধা হবে না।" বলে তাকাল মার্কিন আর নিউজীল্যাণ্ডীয় যুবক দুটির দিকে—আমরা সশব্দে হেসে উঠলাম। কিন্তু নিজ নিজ হাত দু'খানি সুন্দর হলে কি কম খুশী হই, তা বলে?

এবার আমরা যাচ্ছি কাঁচের কারখানার উদ্দেশ্যে। নদীর গলিঘুজি পার হয়ে আবার ক্যানেলে এসে হাঁপ ছাড়লাম। হঠাৎ মাথার উপরকার সেতুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুরসিক পথপ্রদর্শক বলল, "এটি কিন্তু একটি দেড়শ বছরের সাময়িক ব্যবস্থা। শীগগীরই আমরা

এর বদলে একটি পাকাপাকি সেতু করে ফেলব, আমার প্রপিতামহের আমল থেকে আমরা তা ভেবে আসছি। কিন্তু আমরা বড় গরীব, তার উপর যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ একেবারেই ধ্বসে পড়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। যা হো'ক, ওসব আমরা ভাবি না।" ওরা ভাবে না বলল, কিন্তু আমি চারদিকে তাকালাম—এমন সুন্দর ছোট শহরটি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে কত না সুন্দর দেখাত! যুদ্ধ-শেষের কলকাতা দেখ্‌তে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু ইউরোপে বলেই হয়ত এ অপরিচ্ছন্নতার কল্পনা করাটাও আমার পক্ষে একটু শক্ত। সরু গলি অর্থাৎ পায়ে চলা পথগুলি বাড়ীর গা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে; যত রাজ্যের আবর্জনা তার উপর। বিপরীতমুখী দুই পথিকের সংঘর্ষ না হওয়াটাই আশ্চর্য। তারই মধ্যে যখন ঐ দেশীয় পথিকেরা থমকে দাঁড়িয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, "সিনরিটা, তুমি কোথা হতে আসছ?" অর্থাৎ অদ্ভুত তোমার পোষাক, এদেশে ত দেখিনি! ব্যাপারটা মোটেই তখন প্রীতিকর ঠেকে না। তবু হাসিমুখে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে এগিয়ে যাই। ছোট ছেলের দল চারপাশে ভিড় করে, "সিনরিটা" "সিনরিটা"—অর্থাৎ ও মেয়ে, তুমি একটু দাঁড়াও। আবার থেমে আবার এগিয়ে চলি সহাস্যমুখে প্রশ্ন করতে করতে "লা পোস্টা" অর্থাৎ পোস্টাফিস কোথায়?

টাকা ভাঙাবার প্রয়োজনে ব্যবসাকেন্দ্রে যেতে হয়েছিল একদিন। বাড়ীটি খুঁজে বার করতে দেরি হওয়ায় রাস্তায় দু'একটি দারোয়ান বা বেয়ারা গোছের লোকের সাহায্য নিই। অবাক বিস্ময়ের সংগে দেখলাম তাদের পারিশ্রমিক আমাকে দিতে হল ২০০ লীরা (১৫০ লীরা=১ টাকা)। এর পর যে ক'দিন ছিলাম সাহায্য নিয়েছি

শ্রমিক রমণীদের। ওরা হাসিমুখে সাহায্য করেছে, যে বাড়ীটি খুঁজে পাইনি তাতে এনে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

একদিন প্রয়োজন হয়েছিল কিছু টাকার। টাকার অভাবে বড় মুশকিলে পড়তে হবে মনে করে ভারতীয় দূতাবাসের অভাবে ব্রিটিশ কনস্থলেটের শরণাপন্ন হই। আমরা ত কমনওয়েলথের হিস্‌সাদার। ব্রিটিশ রাজদূত আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন সরাসরি। তবে সৌজন্যের মধ্যে এটুকু করেছেন—রোমের ভারতীয় দূতাবাসের ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিতে বলেছেন। তৎক্ষণাৎ পাসপোর্টের নম্বর, নাম, ঠিকানা, ভেনিসের বর্তমান ঠিকানা প্রভৃতি দিয়ে এক্সপ্রেস ডেলিভারী একটি চিঠি দিলাম। ভেনিস থেকে রোম বারো ঘণ্টার পথ। প্লেনে চিঠি যেতে একঘণ্টারও বেশী সময় লাগে না। তারপর আমি আরও তিনদিন ভেনিসে ছিলাম। ভারতীয় দূতাবাসের চিঠি পৌঁছে নি। তারপর অবশ্য এ পর্যন্ত আর কোন খবর পাই নি। তাতে আশ্চর্যও হই নি। তবে বিদেশে বিপদে পড়লে আমরা যে কার সাহায্য নেব, তার সন্ধান এখনও পাই নি।

ভেনিসের কাঁচের কারখানা অর্থাৎ কাঁচের বাসন তৈরি ও তার উপর কারুকার্য করা ইত্যাদি দেখতে সত্যই সুন্দর। প্রথম দেখলাম কি করে বিরাট চুল্লীর ভিতরে কাঁচকে গরম করে ইচ্ছামত বেঁকিয়ে তৈরি হয় বাসনপত্র। কাঁচা মাল আসে অদূরবর্তী "মুরানো" বন্দর হতে। চুল্লীগুলোর তাপ-নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইচ্ছামত। আট বৎসর বয়স হ'তে শুরু হয় শিক্ষানবিশী, তারপর ক্রমশ গুণানুযায়ী শিক্ষার্থীরা শিক্ষাদাতার পদেও উন্নীত হতে পারে। বর্তমান শ্রম-নিয়ন্ত্রণ আইনের দরুণ ছোট ছেলেরা লুকিয়ে কাজ করে, বড়রাও আট ঘণ্টার বেশী খাটতে পারে না। ঘরেও উত্তাপ অসহ্য। এ ঘর থেকে আর একটি

ঘরে গেলাম, সেখানে গ্যাস বার্ণার জ্বালিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করছে নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর কারিগরের দল। কাঁচের চুড়ি-মালার উপর সোনার পাত গলিয়ে করছে নানারকম নক্‌সা। চুনি এবং পান্না রঙের জমির উপর এই সোনার কাজের খোলতাই হয় বেশী। তার ফলে অতি সাধারণ একছড়া মালার দাম ১৫০৲, ২০০৲ টাকা। বিশেষ ধরণের জিনিসগুলি নাগালের বাইরে।

এবার কাঁচের কারখানার "শো-রুম"। কর্মচারী এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। হঠাৎ চারদিক থেকে রাশি-রাশি ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় যেন রাঙা হয়ে গেল পরীর দেশ। চারদিকে হীরা, মতি, পান্না, চুণীর ছড়াছড়ি। যেদিকে তাকাই চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছা করে না। এ যেন রূপকথার রাজ্য। রাশি-রাশি ফুলদানি, মদের পাত্র, টি-সেট, অপরূপ কারুকার্যশোভিত। আর রঙ ও গুণ অনুযায়ী সব সাজানো হয়েছে, তারা ক্রেতাকে আহ্বান করছে সাদরে।

ওখান থেকে চলে এলাম পাশের ঘরে যেখানে আছে একটি কাঁচের দ্রাক্ষা ক্ষেত। অবশ্য কাঁচের যে, সেটা বুঝেছিলাম অনেক পরে। তার পাশের ঘরটি কেবলমাত্র ঝাড়লণ্ঠনের রাজ্য। তার আলোতে সৃষ্টি হয়েছে স্বপ্নের মায়াপুরী। চারদিকে দেয়ালে বিলম্বিত নানা ঢং ও নানা আকারের ভেনিসীয় মুকুরে তার প্রতিফলন—সে স্বপ্নকে করে তুলেছিল অপরূপ।

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, "ভারতীয় সিল্ক আর ভেনিসীয় কাঁচ, দুয়ে মিলে কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছে।" চমকে ফিরে দেখি কারখানার মালিক সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করছেন। বললাম, "ধন্যবাদ, তোমার কারখানাটি দেখে সত্যিই তৃপ্তি পেলাম। ভেনিসীয় কাঁচের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী কেন, তার অর্থ এবার বোধগম্য হ'ল।"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার তাহলে ভাল লেগেছে। কিছু কেনো না কেন?"

বললাম, "কেনবার জন্য ত রাখ নি, রেখেছ দেখবার জন্য।"

তিনি হেসে বললেন, "তোমার কাছে বড় বেশী দাম লাগছে বুঝি?"

সঙ্গীরা তাড়া দিচ্ছিল। পা বাড়ালাম দরজার দিকে। সংগে চলতে চলতে তিনি বললেন আবার, "আচ্ছা এত সুন্দর ইংরেজী শিখলে কোথায়?"

বাধা দিয়ে বললাম, "এতকাল ব্রিটিশ প্রজা ছিলাম, ও কথা জিজ্ঞাসা করাই ত বাহুল্যমাত্র। বরং তুমি শিখলে কোথায়?"

"তোমার দেশে"—মৃদু হেসে বললেন।

বিস্মিত হয়ে বললাম, "আমাদের দেশে গিয়েছিলে ইংরেজী শিখতে?" বললেন—"না, তোমার দেশে ভূপাল বলে একটি রাজ্য আছে জান?"

বললাম "তা আর জানি না।"

"সেখানকার নবাব দুটো 'স্যাণ্ডেলিয়ার' কিনেছিলেন এই কারখানা থেকে। আমি তখন এই কারখানায় সামান্য বেতনে কাজ করি। মনিবের আদেশে ঐ বাতি দুটো নবাবের দরবারে ফিট করার জন্য আর একজন সহকর্মীর সংগে যাত্রা করি বিশেষ একটি জাহাজে। একমাসে গিয়ে ভূপাল পৌঁছই। আর রাজ-অতিথিরূপে বাস করি দু'বছর। সে দু'বছরের স্মৃতি কোনদিন মুছবে না মন থেকে। ভারতীয় মেয়ে দেখামাত্রই ইচ্ছা হল একটু আলাপ করার, পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল মনে। আশাকরি কিছু মনে করবে না।"

বললাম, "তোমার সংগে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম, আমার দেশের কথা বিদেশে এমনভাবে শুনব ভাবিনি।"

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মুগ্ধতার রেশটুকু কেটে গেল ভেনিসের সঙ্কীর্ণ ধূলিবহুল অপরিচ্ছন্ন গলিতে পা দিয়েই। ভাবলাম যে দেশের শিল্পী এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে পারে সে দেশবাসীরা কি চেয়ে দেখে না এ পথের মালিন্য ?

সব তিক্ততার রেশ আবার ক্ষীণ হয়ে যায় শিল্পাগারে ('Academy of Fine Arts') প্রবেশ করে। চিত্ররসিকদের কাছে ভেনিস নগরী চিরকাল কল্পনা আর সংস্কৃতির খোরাক জুগিয়েছে আর জোগাবেও যুগ যুগ ধরে। বিশ্ববিখ্যাত ভেনিসিয়ান তথা ইটালীয় চিত্রকরদের সেরা চিত্র দিয়ে সাজান হয়েছে এই মিউজিয়ামটি। টিসিয়ান, টিণ্টরেটো, ভেরোনিজ প্রভৃতির লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় মেলে এখানে। তা অনুভবের বস্তু, বিশ্লেষণের নয়। আমি শিল্পী নই, শিল্পরসিকও নই। তবে সেদিন এই একাডেমিতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিকৃতির পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে নির্যাতীতের বেদনাও ভুলে গেলাম মুহূর্তের জন্য। চকিতে ভেসে উঠল চোখের সামনে শিল্পীদের অপূর্ব নিষ্ঠাভরে এঁকে যাওয়ার দিনগুলি। প্রগাঢ় নিষ্ঠা অতুলনীয় অধ্যবসায়কে করেছিল সাফল্যমণ্ডিত। তাই 'ডুগাল' প্রাসাদের—যেখানে দাঁড়িয়ে 'নিঃশ্বাস-সেতু' (Bridge of Sighs) সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীতের বন্দীদের নীরব অশ্রু আর বিষাদপূর্ণ শেষ নিঃশ্বাসের—কারুকার্যখচিত প্রাসাদের সেই শিল্পভবনের চেয়েও অধিক আকর্ষণী শক্তি এই একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের। বহু দরিদ্রের বুকের রক্তে গড়া ডুগাল প্রাসাদের কুখ্যাতি আর সুখ্যাতি মিলিয়ে যাবে একদিন কালের বুকে। কিন্তু চিরজয়ী হবে ক্ষণভঙ্গুর স্ফটিক আর বেলিনী, টিণ্টরেটো,

বোকাসিও। এরা ভেনিসের গৌরব, অতীত সম্রাজ্ঞীর মুকুটের কোহিনূর। সম্রাজ্ঞী হারিয়েছেন তার রাজ্য, কিন্তু কোহিনূর দ্বিধা-বিভক্ত হয়েও বিতরণ করছে সপ্তরশ্মি দর্শনার্থীকে।

শিল্পভবন থেকে বেরিয়ে এলাম সাঁঝের রঙীন আলোয়। ক্যানেলের তীরে তীরে জ্বলে উঠেছে আলোর মালা। তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে সুনীল ক্যানেলের নীরে। গণ্ডোলার মাঝি তাকে ভেঙে দিচ্ছে খান খান করে। দিনান্তের মৃদু বাতাস ক্লান্ত পথিককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল পিছনে ফেলে আসা গৃহ-কোণটির কথা। সব আবিলতা ভেসে গেল এবার কলকল করে ছুটে আসা আত্মিয়াতিকের জোয়ারে। মনের মধ্যে ভিড় করে এলো শেলী, ব্রাউনিং কীটস্, গ্যেটে। গোধূলির ভেনিস রহস্যময়ী। সত্যিই তার তুলনা নেই।

ভিয়েনা

আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলন

১৯৫২ সালের ১২ই থেকে ১৬ই এপ্রিল—অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলন। পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে ৭৪টি দেশের ৬০০ জন প্রতিনিধি এখানে মিলিত হয়েছেন তাঁদের শিশুদের বাঁচাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এর মধ্যে আছে, আইসল্যাণ্ড, আরব, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি ; তুরস্কের আর ফ্রান্সের মহিলা, রাশিয়া, সুইডেন, রুমানিয়া, হাংগেরী ও ইংল্যাণ্ডের শিক্ষক, চীনের ডাক্তার ; বেলজিয়াম আর ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া আর মঙ্গোলিয়া—পৃথিবীর কোন কোণই বাদ যায়নি। সবাই সমবেত হয়েছেন—কি করে আমাদের সন্তানরা সুখী ও সুস্থ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে তারই সমাধানে।

শিশুশিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষার্থী আর ভারতের শিক্ষয়িত্রী হিসাবে আমিও প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম—৭৪টি পতাকাশোভিত উৎসব-মুখরিত ভিয়েনার সেই "মিউজিক হলে।" সারা হলটি সাজানো হয়েছে শান্তি-প্রতীক, মুক্ত আকাশের গাঢ় নীলবর্ণের পতাকা দিয়ে। ফুলে সাজান মঞ্চের উপর শাদা, কালো আর পীত তিনটি শিশুর সহাস্য প্রতিমূর্তি জানিয়ে দিচ্ছিল কী আমাদের লক্ষ্য। এই মঞ্চেরই উপর দাঁড়িয়ে যখন একের পর এক প্রতিনিধিরা জানালেন তাঁদের দেশের বিবরণ, সারা জগত স্তব্ধ হয়ে শুনল—অবহেলায় কি করে জাতির অমূল্য সম্পদ ঝরে পড়ে অকালে, অথচ কত সামান্য আগ্রহ আর চেষ্টায় তাদের ফুটিয়ে তোলা যায় তারুণ্যের সার্থকতায়।

প্রথম দুদিন কাটল সাধারণ অবস্থা বর্ণনায়। মঁসিয়ে মনো ফরাসী প্রতিনিধি, তিনি পেশ করলেন শিশুদের অবস্থা বিষয়ে রিপোর্ট। তারপর এক এক করে সবাই জানালেন—নিজ নিজ দেশের শিশুদের অবস্থা। আমরা আমাদের দেশে যা চোখে দেখি তার চেয়ে ভাল ত' নয়ই, কোন কোন দেশে এর চেয়েও তা খারাপ। আমাদের দরিদ্রদেশে ত কত দেখি—শিশুরা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে, না খেয়ে শুকিয়ে মরে, শিক্ষার অভাবে কুপথে যায়, আর খাবার অভাবে কিংবা অন্যের প্ররোচনায় শেখে চুরি করতে। দুধের অভাবে পিটুলীগোলা জল খাওয়া ত চলে আসছে সেই মহাভারতের আমল থেকে। পড়াশোনা করা ত এদের কাছে বিলাসমাত্র।

শুধু আমাদের দেশ বলেই নয়, ঔপনিবেশিক দেশগুলির সর্বত্রই এই চেহারা। সবদেশেই শিশুমৃত্যুর কারণ, অপুষ্টি—শিশুর এবং গর্ভবতী মায়ের। আর এই অপুষ্টির কারণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হয় না। বাপ মা যেখানে কোন রকমে একবেলা খাবার সংস্থান করতে পারে না সেখানে পুষ্টির প্রশ্ন ত অবান্তর। তাই ডাক্তার যখন শিশুকে দেখতে এসে বলেন, "এর প্রয়োজন ত দুধ, ওষুধ নয়", বাপ মা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, "চিরটাকাল আমরা বেঁচে এলাম বিনা দুধে, ভগবান দিলে ওতেই বাঁচবে। দুধ পাব কোথায়?" এমনি অনেক দেশেই শিশুকে আমরা মনে করি "দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক"—তাই অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দাসত্ব, বাসস্থানের অব্যবস্থা তার ভাগ্যে জুটলে আর কি করা যায়? এর ফলে যে জাতি এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের মুখে সেদিকে আমাদের নজর নেই। শিশুরক্ষা আইনগুলি কাগজে-কলমেই আছে, তার প্রয়োগ করা হয় না। ৫ বছর বয়সে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে আফ্রিকার ছেলেমেয়েরা বাপের সঙ্গে মজুরী খাটে। ৮ বছরে

ইটালীয় ছেলে কারখানায় কাজে লেগে যায়, ৭ বছরের ইরানী ছেলে মা-বাপের সংগে কার্পেট বোনে, জাপানের ছেলেমেয়েরা তূলোর থেকে সুতো বোনে—আমাদের দেশেও ভিক্ষা থেকে শুরু করে চাষের কাজে সাহায্য, নৌকা বাওয়া, গরু চরান, চায়ের দোকানে চাকরী, চা-বাগানে পাতা তোলা এগুলি ত নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যে গণ্য। যেখানে যা সব চেয়ে সস্তা তাতেই তার প্রাণরক্ষা হবে—ব্রাজিলএর শিশুরা দুধের বদলে খায় চা, পশ্চিমদ্বীপপুঞ্জের শিশু খায় কলা। মিশর, কিউবা, আলজিরিয়া, সাইপ্রাস, চিলি, এমন কি জাপানেও এরা জানে না স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কাকে বলে। বেশীর ভাগই মরে ম্যালেরিয়া, যক্ষা, সিফিলিস্‌, কালাজ্বর আর বসন্ত, কলেরায়।

কোন কোন দেশে শিশুবিক্রীর চল এই বিংশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান। এই সেদিনও পুরনো চীনে পরিবারের জন্য বউ কেনা হত।

যারা সভ্য এবং স্বাধীন বলে গর্ব করে, যাদের জীবনধারণের মান আমাদের তুলনায় অনেক উন্নত, তাদের দেশেও বিপদ কম নয়। কানাডা থেকে প্রতি মিনিটে ৪০০০ ডলার করে খরচ করা হয় যুদ্ধের জন্য, অথচ ১০,০০০ মা পান না প্রয়োজনীয় ডাক্তারী সাহায্য। প্যারী আর লণ্ডন, নিউইয়র্ক আর ডাবলিনের বস্তীগুলোতে বাস করে হাজার হাজার শিশু। সরকারের প্রায় সব টাকাই ত যায় "আত্মরক্ষার" প্রস্তুতিতে; ওদের জন্যে আর কি থাকবে অবশিষ্ট? ফ্রান্সে গৃহহীন লোকের সংখ্যা ৫০ লক্ষ, বৃটেনে ২০ লক্ষ, ইটালীতে ৩০ লক্ষ আর ডেনমার্কের ১৫০ লক্ষ লোক বাস করে চার্চ আর পুরনো বাড়ীগুলিতে। ভারতবর্ষে প্রতিহাজারে ৪০০ শিশু মারা যায় অকালে, মিশরে ৬৩০, পর্তুগালে ১০৮, ইটালীতে ৮২, অষ্ট্রিয়ায় ৬৬, সুইডেনে

হাজারকরা ৩৫। প্রতি হাজার নবজাত শিশুর মধ্যে কিউবাতে ৮৫০ মারা যায় ১ বৎসর বয়স হবার আগেই, দক্ষিণ-আফ্রিকাতে ৪৫০ জন মারা যায় ১ বৎসরের আগে আরও ১০০ যায় ৩ বছর হবার আগে, ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে ১ বৎসর না হতেই মরে ১৩৭টি শিশু, ব্রিটেনে ৩১টি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৯টি। ব্রাজিলে শতকরা ৫০টি শিশু ১৪ বৎসর অবধি বাঁচে।

যারা লেখাপড়া শেখে, অর্থাৎ কোনরকমে বর্ণপরিচয় শেষ করে, তাদের সব দেশেই সাধারণ পাঠ্য ডিটেক্‌টিভ বই আর সিনেমা। এই জাতীয় সিনেমাগুলোর ছবি শতকরা ৭০ ভাগই অপরাধমূলক—চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি। শিশুর রুচিমন ঝুঁকে পড়ে অতি সহজেই, তাই অন্যায়কারীকেই মনে করে বাহাদুর, আর অলক্ষ্যে তার মনের মধ্যে বাসা বাঁধে ঐ দুষ্কৃতিকারীর অনুকরণেচ্ছা। (দেশে ফিরে দেখলাম আমাদের দেশেও এ জাতীয় সিনেমার বহুলপ্রচার শুরু হয়েছে—আর অপরাধমূলক বইগুলো এমন কি স্কুলেসুদ্ধ উপহার পেতেও বাধা নেই।) অবশ্য সবগুলো বইই মামুলী ভাবে আরম্ভ করা হয় "পাপী সাজা পাবেই" এই লিখিত উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু দুর্দান্ত খুনে ডাকাতের সাহস ও দুর্ধর্ষতা এমন ভাবেই চিত্রিত হয় যে তাতে অপরিণত মনে চমক লাগে আর মানুষের মন এমনি বিচিত্র জিনিস যে, ঐ মৌখিক বাধা-নিষেধের আর শাস্ত্রানুশাসনের মামুলী দোহাই দিয়ে সে নিজেরও অলক্ষ্যে ঝুঁকে পড়ে ঐ পুলিশের হাতে নিপীড়িত অপরাধকারীর দিকে। নিষ্ঠুরতা, পরপীড়ন তাই শিশুদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে দেয়—জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইটালী থেকে পাওয়া গেল ভুরি ভুরি প্রমাণ। বেলজিয়ামের গটিংগেন শহরে একটি ১৬ বছরের ছেলে একটি ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে তার

ড্রাইভারকে হত্যা করে তারই গলার টাই দিয়ে—যেমনি করে লেখা ছিল তার প্রিয় বই "বিলি জেঙ্কিন্স" আর "টম সার্ক" জাতীয় ডিটেক্‌টিভ বইগুলোর মধ্যে। বেলজিয়ামেরই 'নামুর' শহরে দুটি ছোট ছেলে তাদের সংগীকে মেরে থলের মধ্যে পুরে পাথরের স্তূপের তলায় চাপা দিয়ে রাখে; "ওরকম যে ছবিতে দেখেছি"—বলে তাদের একজন। এদের জন্য প্রয়োজন কি জেলখানার নিরাপদ আশ্রয়?—না, ঐ বই আর সিনেমাগুলোর পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর আর শিক্ষাপ্রদ আবহাওয়ার সৃষ্টি? ঐ চিত্র-পরিচালকরা আর লেখকেরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন কিরূপ শিশুমন তৈরি হচ্ছে এ্যাটমবোমার প্রশস্তি শুনে ও অজ্ঞতা পোষণ করে সুস্থজীবনের প্রতি?

অশিক্ষা আর অভাব যেখানে ছেয়ে ফেলেছে সারা পৃথিবী সেখানে সামান্য আশার কথা শুনলেও উৎসাহ জাগে। তাই পশ্চাৎপদ দেশ রুমানিয়ার প্রতিনিধি যখন বললেন—"প্রাক্-যুদ্ধযুগে যাই থাকনা কেন, আজ দেশ ক্রমশ এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ করতে।" উৎকর্ণ হয়ে তা শুনলাম। শতকরা ৮০টি শিশু সেখানে আইনের সুবিধা পায়, নবজাত শিশুর জন্য বিশেষ যত্ন আর অশিক্ষিত মায়েদের বিশেষ করে শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪৫টি। ৭৫—৮৫ ভাগ বেড়েছে শিশু-স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আইনকানুন, শিশুডাক্তার বেড়েছে ৫গুণ, ধাত্রী ৩ গুণ। শিশুরক্ষণাগার আর প্রসূতি সদন বেড়েছে ৫ গুণ আর শিক্ষার্থী শিশুর সংখ্যা বেড়েছে আগের তুলনায় ৯গুণ। চীনে শিক্ষা করা হয়েছে বাধ্যতামূলক—আর যত্ন ও চেষ্টার ফলে শিশুমৃত্যু আজ অজানা সেদেশে। চীন ত আমাদেরই দলের দেশ। সুইডেনে আজ শিশুমৃত্যুর হার অসম্ভবরকম কমে গিয়েছে আর আইন করে সেখানে শিক্ষা

বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ১৯২১ সালে। অবশ্য সুইডেন প্রথম শ্রেণীর দেশ নানা দিকে।

ছোট পার্বত্য দেশ আলবানিয়া—সাড়ে এগার লক্ষ তার অধিবাসী। সেখানে প্রসূতিরা ছুটি পায় ৯০ দিন, ১৭৬টি নার্শারী স্কুল, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, যুদ্ধোত্তরযুগের স্কুলের সংখ্যা তাই প্রাক্-যুদ্ধযুগের চেয়ে ২০ গুণ বেশী।

বুলগেরিয়াতে ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। শিশুদের জন্য আছে সিনেমা, থিয়েটার, মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ, ব্যায়ামাগার, ছুটির কেন্দ্র (Holiday Home), আর স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে অগুণতি।

সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা আজকের দিনে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়। সেখানকার প্রতিনিধি বিবরণ দিলেন—কি রকম করে দিনের পর দিন সেদেশের লেখকরা সৃষ্টি করে চলেছেন শিশুসাহিত্য। তার মধ্যে আছে মৌলিক রচনা, আছে দেশবিদেশের সাহিত্যের অনুবাদ—কিন্তু নেই তথাকথিত 'কমিক' বইগুলো আর অপরাধমূলক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শিশুচরিত্রের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনই সেদেশের সরকারের লক্ষ্য। তাই বিগত যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও শিক্ষার ব্যয়টা 'পুনরস্ত্রীকরণের' জন্য না ঢেলে, রাশিয়ায় লাগানো হয়েছে ভাবী নাগরিকদের উন্নতিকল্পে।

বিভিন্ন দেশের অবস্থা আলোচনা করে এর পর প্রতিনিধিরা কতগুলো প্রস্তাব পেশ করলেন—শিশুকে সুস্থ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে যা অপরিহার্য। সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হ'ল সেদিন।

পৃথিবীর পরিধি ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছে বিজ্ঞানের সহায়তায়।

এর এককোণে বোমা পড়লে আর এক কোণে নিজের সন্তানকে নিরাপদে আজ আঁর লুকিয়ে রাখা যায় না। যে কোন দেশে যে কোন শিশুর জন্য আজ ভয়াবহ আতঙ্ক এই নাপাম বোমা। কথাটা দেশে বসে এত বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু পৃথিবীর অধিবাসীর সামনে আজ দুটো পথ—শান্তি, না, এ্যাটমবোমা? এর একটাকে বেছে নিতেই হবে। যুদ্ধ কিংবা এ্যাটমবোমার আঘাতে সব ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যায়। তাই আমরা মায়েরা আর মেয়েরা অন্তত চাই পৃথিবীতে আসুক শান্তি। সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াইএর সংগে চালাতে হবে অভিযান। পুনরস্ত্রীকরণের ব্যয়ভার না কমালে, শিশুস্বাস্থ্য আর শিশুশিক্ষার উন্নতিকল্পে কোনো দেশেই আর কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

বিশেষ বিবেচনার পর শিক্ষাকমিশন গ্রহণ করলেন এই প্রস্তাবগুলো:—

(১) সবদেশের সব শিশুর জন্য চাই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা। সে শিক্ষা দিতে হবে বাস্তবের সংগে সংগতি রেখে, জীবনের গতির সংগে তাল রেখে।

(২) বই এবং আনুষংগিক জিনিসপত্রের দাম যথাসম্ভব কমিয়ে, সম্ভব হলে বিনামূল্যে, দেবার ব্যবস্থা করা।

(৩) সস্তায় এবং বিনামূল্যে স্কুলে খাবার ব্যবস্থা।

(৪) বেতের দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার পুরাতন পদ্ধতি বদলিয়ে নূতনতর পদ্ধতি গ্রহণ।

(৫) স্কুলবাড়ী তৈরী করা।

(৬) প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তার ও ব্যবস্থা।

(৭) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(৮) বিকলাঙ্গের জন্য বিশেষ শিক্ষা।

এই ত গেল শিক্ষাবিস্তারের দিকটা। তার সংগে বাজেয়াপ্ত করতে হবে অপরাধ-বর্ণনার বইগুলো। নিষিদ্ধ করতে হবে ছেলেদের জন্য যৌন আবেদনমূলক সিনেমা আর অপরাধ-সংক্রান্ত ছবি। যে বই আর ছবি অপরাধী গড়ে তুলতে সাহায্য করে, তাদের বাজেয়াপ্ত করার সংগে সংগে নিষেধ অমান্যকারীকে দিতে হবে কঠোর শাস্তি। আর তারই সংগে প্রচার করতে হবে চরিত্রগঠনের সহায়ক গল্প, উপন্যাস —শিশুদের জন্য।

শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলা আর তারই প্রধান উপায় হবে—শিক্ষাদাতারও অবাধ স্বাধীনতা। বাহিরের বিশ্বের নূতনতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর সংগে শিক্ষকদের পরিচয় করে দিয়ে তাদের হাতে দেওয়া হবে জাতিগঠনের ভার। তার সংগে চাই তাদের অন্নচিন্তা সমাধানের প্রতিশ্রুতি। অন্নচিন্তায় বিব্রত থাকলে সুষ্ঠু শিক্ষাদানে ব্যাঘাত ঘটবেই। "নিরীহ স্কুলমাস্টার"কে দিতে হবে সামাজিক মর্যাদা, যাতে তারা সবাই এগিয়ে আসেন শিক্ষাভার গ্রহণ করতে সানন্দে।

প্রচুর পরিমাণে হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, আর শিশু-শ্রমনিবারক আইনের প্রসার না হলে, কেবলমাত্র শিক্ষার সহায়তায়ও শিশুমৃত্যু নিবারণ করা যাবে না। আর সেরূপ আইন প্রণয়ন করতে হলে চাই শিক্ষক, ডাক্তার, অভিভাবক, বাপ, মা আর জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। সম্মেলন বললে—তাদের কাছে তাদেরই ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখবার জন্য আবেদন জানান হোক্।

সর্বশেষে পৃথিবীব্যাপী সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে সম্মেলন আবেদন জানালেন—"এস, আমরা সকলে মিলে আমাদের জাতিকে

বাঁচাবার জন্য স্বাস্থ্য, কৃষ্টি আর নীতির উন্নতিকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করি। এস, মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাই অপরাধ-প্রচারক বই আর ছবি আর বেতার-বক্তৃতার বিরুদ্ধে। এস, আমরা নিরস্ত্রীকরণ সমিতির কাছে প্রতিবাদ জানাই সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে; আর দাবী করি ঐ অর্থ শিশুকল্যাণে ব্যয় করার জন্য। এস, আমরা মুক্তকণ্ঠে সজোরে প্রতিবাদ জানাই জীবাণুযুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং ভবিষ্যতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সচেষ্ট হই। এস, পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করে আমাদের সন্তানদের বাঁচাই। এস, দেশে দেশে জাতীয় কমিটি সংগঠন করে শিশুরক্ষা আন্দোলনকে দৃঢ়তর করি।"

জানি, লোকে বলবে—এসব 'কমিউনিস্টদের' চাল; এই শান্তির প্রস্তাব তাদের মনের কথা নয়। সত্য মিথ্যা জানিনা; কিন্তু 'চাল' ত সবাই দিচ্ছে পৃথিবী জুড়ে। মুখেও তবু যত লোক এই শান্তির চেষ্টা করছে তারা যদি সবাই কমিউনিস্ট হয়, তা হলে ত অ-কমিউনিস্টদের বেশী প্রশংসা করতে পারি না। তাদেরও মনের কথা জানবার উপায় নেই, কমিউনিস্টদেরও জানবার উপায় নেই। তা হলে অ-কমিউ-নিস্টরাও কেন মুখেও অন্তত এমন শান্তির প্রচারই করুন না? আমরা দুনিয়ার মায়েরা তা হলে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারি—ছেলেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু ভরসা পাই।

ভিয়েনার অন্যতম আকর্ষণ

সেদিনটি ছিল পয়লা বৈশাখ ১৩৫৯। ভিয়েনায় আগত শিশুরক্ষা-সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিরা অর্থাৎ ডাক্তার শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমল সাহা, শ্রীধ্রুবরঞ্জন সরকার, শ্রীশান্তা মুখার্জী, মিসেস ডি

আর ডি ওয়াদিয়া, আর আমি স্বয়ং আমাদের দোভাষিণী মাদাম পিঙ্কনার সহ উপস্থিত হলাম ভিয়েনাস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে নববর্ষের প্রীতি-সম্মিলনীতে। অবশ্য শ্রীরামস্বামী তার আগে আমাদের হোটেলে এসে যথারীতি নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন।

ভারতীয় খানার সংগে চলল আলাপ আলোচনার পালা। হঠাৎ নবপরিচিত বাঙালী ভদ্রলোক নীচু গলায় জিজ্ঞাস করলেন "এই ভদ্র-মহিলাকে চেনেন ?" বললাম "না ত। আমি ত এখানে দু'দিনের অতিথি মাত্র, সবাইকে চেনা সম্ভব কি ?"

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন "কিন্তু তিনিই ত এখানকার প্রধান আকর্ষণ !"

জবাব দেবার অবকাশ না দিয়ে শ্রীযুক্ত রামস্বামী এগিয়ে এলেন, "আসুন পরিচয় করিয়ে দি, ইনি শ্রীমতী বসু।"

নিজেকে ঝাঁকুনী দিয়ে সোজা করে নিলাম—সামলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম সোজা, জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার মেয়ে কোথায় ?"

সহাস্যে জবাব দিলেন, "আছে এই কোথাও। তুমি বস আমার পাশে, এস গল্প করি ; ও আসবে এক্ষুণি।" মেয়েদের আত্মীয়তা হ'তে খুব সময় লাগেনা, বিশেষ যদি উভয়েরই থাকে সন্তান। তাই অনিতার ও তার মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতীয় দূতাবাস থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, নিজেরই অজান্তে চোখের পাতা এল ভারী হয়ে, গাড়ীতে বসে ভাববার অবকাশ মিলল।

পরের দিন যখন হোটেলের পরিচারিকা এসে বললে, "তোমার টেলিফোন" আমি ত ভেবেই পেলাম না এই অজানা রাজ্যে আমাকে কে টেলিফোন করতে পারে। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে টেলিফোন ধরলাম, "হ্যালো নন্দী, আমি মাদাম শেংকেল।" তবুও যখন

অপরিচিতির কুয়াসা কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না, আবার ওপার থেকে ভেসে মিষ্ট গলা এল, "বুঝতে পারছ না? সেই যে ইণ্ডিয়া লিগেশনে পরিচয় হয়েছিল।" বিদ্যুৎচমকের মত ভেসে উঠল সেই মুখ, চোখের সামনে। বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব চিনতে পারছি। কি ব্যাপার বলুন।"

"ব্যাপার বিশেষ কিছুই না। তোমার সংগে একটু আলাপ করার ইচ্ছা, কোথায় তোমার সংগে দেখা হতে পারে?"

আমিত বিস্ময়ে হতবাক্"—বললাম, "তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমাদের নেতাকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি।"

যাই হোক, দেখা তাঁর সংগে আমার সেদিন এবং তারও পরে আরও একবার হয়েছিল, তার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তবে একটা কথা আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল। সেটি হোল, "তোমার দেশের লোকেদের ব্যক্তি-পূজার আদর্শটা কি ধরণের আমি কিন্তু বুঝে উঠতে পারিনা। আমাকে দেখলেই বলবে, "অটোগ্রাফ দাও", "না হয় ছবি দাও"। তাও না হয় বুঝলাম, তোমাদের "নেতাজীর" খাতিরে আমি সেগুলো সহ্য করি। কিন্তু আমার মেয়ে—বয়স তার মোটে নয় বছর—তারও মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া সে কত বড় বাপের মেয়ে, এ কী রকম? গরীব মানুষ আমি, খেটেখুটে যা উপায় করি কোনরকমে আমি, মা, আর অনিতা খেয়ে বেঁচে আছি। অনিতাকে খুব খরচ করে পড়াতেও পারিনা। নেতাজীর নাম করে তোমার দেশ থেকে টাকা নেওয়াটা আমি অগৌরবের মনে করি। আমার মেয়ে আগে নিজে মানুষ হবে, তারপর তার বাবার সম্মানে গৌরব বোধ করবে। ওর কচি মাথায় এগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া যে ভাল নয় একথাটা কেন তোমরা বোঝনা?"

আমার দেশবাসীর অগৌরবের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে বললাম

সবিনয়ে, "আমরা বড় ভাবপ্রবণ জাতি। বিশেষত আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইনি বলে আর নেতাজীর আকস্মিক তিরোধানের বেদনায় আমরা সব সময় ঠিক মাত্রা রাখতে পারিনা। ভিয়েনীজরাও ত অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, সেই অনুভূতি দিয়ে বিচার করে আমাদের চাপল্য মার্জনা করবেন, আশা করি।"

বাধা দিয়ে বললেন, "আরে তুমি এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? তুমি অটোগ্রাফ আর বাণী চাওনি বলেই না তোমার সংগে আবার আলাপ করতে পারছি। আর একটা ঘটনা শোন, এক ভদ্রলোক একদিন সকাল বেলা দরজার কড়া নাড়তে, আমি গেলাম খুলে দিতে। হঠাৎ একটা ক্লিক্ শব্দ হতেই খেয়াল করলাম ভদ্রলোকের কাঁধে ক্যামেরা। এ কি রকম ভদ্রতা বলত? বিনা অনুমতিতে কারও ছবি তোলা যে অভদ্রতা শুধু নয়, রীতিমত অপরাধ, সে জ্ঞানও তার নেই কি?"

সশঙ্কচিত্তে স্মরণ করলাম—কি ভাগ্যি, বন্ধুবরের সনির্বন্ধ অনুরোধটা ('আপনার ক্যামেরায় নেতাজীর স্ত্রীর ছবিটা, তিনি কথা বলার সময় তুলে নেবেন, আমার ক্যামেরা থাকলে আপনাকে আর বলতাম না') কাজে লাগাইনি। তাহলে যে আর মাথা তুলতে পারতাম না। শুনলাম মাদাস শেংকেল বলে চলেছেন আবার, "আমাকে আর আমার মেয়েকে নিয়ে তোমাদের কাগজে কাগজে প্রবন্ধ আর হৈ চৈ-এর পালা যে কবে শেষ হবে তাই ভাবি। যাঁকে নিয়ে তোমাদের সংগে সম্বন্ধ তাঁর অবর্তমানে তোমাদের দেশে যাবার কথাও আমি ভাবতে পারি না। তবে কেন আমার বাণী, অটোগ্রাফ আর ছবির জন্য তোমরা এত ব্যস্ত হও?"

বললাম,—"আপনার এই কথা আমি আমার দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেব। জানি না ভবিষ্যতেও আপনি এত উত্যক্ত হবেন কি না।"

এর পরে আরও অনেক কথাই হোল। তারপর তাঁর সংগে আমার আরও দেখা হয়েছে। প্রথম বাধাটুকু অপসারিত হয়ে যাওয়ার পর প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, তাঁর স্নেহ পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেছি। বিদায় নিয়ে যেদিন চলে আসি তাঁর সেদিনের কথাটা আমার জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছি।

"তুমি কি করবে দেশে ফিরে গিয়ে ?"

"নিজের ও পরের ছেলেকে শিক্ষা দেবার নামে ঠেঙানোই আমার পেশা ; দেশে গিয়েও তাই করব।"—বললাম হাস্‌তে হাস্‌তে।

সস্নেহে জবাব দিলেন, "তুমি শিক্ষাদাতা। আশা করি শিক্ষাদানের বিরক্তিতে তোমার মুখের হাসি ম্লান হয়ে যাবেনা।"

মনে মনে বললাম, "আশীর্বাদ তোমার শিরোধার্য করলাম।"

অস্ট্রিয়ার স্কুল

শিশুরক্ষা সম্মেলন (ভিয়েনা, ১৯৫২) শেষ হ'ল ১৬ই এপ্রিল রাত ১টায়। পরস্পরের সংগে শুভেচ্ছা বিনিময় আর দেশে দেশে শিশুসংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম ভিয়েনার প্রশস্ত রাজপথে। বাইরে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য মোটর বাস, ছুটে চলল হোটেল অভিমুখে। সেই রাত্রেই অনেকে ফিরে যাবেন যার যার দেশে। তাই আলাপ-আলোচনা আর গল্পের মাধ্যমে শুরু পরিচয়ের পালা, শেষ হোল বিদায় সম্ভাষণে। দোভাষীকে প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা তোমাদের দেশে এসে তোমাদের স্কুলগুলো না দেখেই ফিরে যাব ?" সে বলল, "আচ্ছা কালই তোমাদের যাবার ব্যবস্থা করব, তুমি তৈরী থেকো।"

পরদিন বাসে উঠতে গিয়ে দেখলাম আমার মত আরও শিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষক আমার আগেই সেখানে এসে বসে আছেন। রাশিয়ান মাস্টার মশাইরা ডাকলেন, "আরে এস এস—এত দেরী কেন?" ওঁরা তিনজন, এঁদের সংগে আলাপ হয়েছিল আগেই। বললাম, "আমিই ত ব্যবস্থা করলাম যাবার, তোমরা আবার এলে কেন?" বললেন, "তোমার কল্যাণে আমরাও একটু ঘুরে আসি পর্বত ঘেরা অষ্ট্রিয়ার গাঁ থেকে।"

প্রথমে গেলাম ভিয়েনার সব থেকে নূতন স্কুলে Volks und Hauptschule Der Stad Wien—এখানে পড়ে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা, সংখ্যায় এরা ৪৫০। অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত এই স্কুলটি ১৯৪৬ সালে ১৫ লক্ষ শিলিং ব্যয়ে তৈরী হয়। ব্যায়ামখানা, ল্যাবরেটরী, ছেলেদের ওয়ার্কশপ দিয়ে সাজান এই স্কুলের ঘরগুলি তৈরী করা হয়েছে শব্দনিয়ন্ত্রক-যন্ত্র বসিয়ে। মাস্টার মশাইরা প্রাণপণে না চেঁচিয়েই পড়াতে পারেন। বিজ্ঞানের ক্লাশ-গুলোর সামনে বিরাট একটি বোর্ড। খোলা দরজার পথ দিয়ে ঐ বোর্ডে প্রতিফলিত হয় বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্ট ছাত্রছাত্রীদের সামনে। স্কুল হয় সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত; আর প্রতিটি ঘণ্টার পর ১০ মিনিট করে বিশ্রাম দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের। স্কুল ইনস্পেক্ট্রেস আমাদের নিয়ে গেলেন একটা জানালার পাশে। ইংগিতে জানালেন, "শব্দ কোরোনা।" দেখলাম ছেলেমেয়েরা ড্রইং করছে। আমাদের দেখে ওরা বিন্দুমাত্র চঞ্চল হলো না। খানিক পরে আমরা যখন ক্লাশে ঢুকলাম ওদের প্রজাপতিগুলির সংগে পরিচিত হতে, আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা সেই জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম সেখানে বিরাট একটি আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে ছাত্রী আর ছাত্রদের চেহারা। এটি এমন

ভাবে তৈরী যে ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চিন্তমনে নিজের কাজ করার সময় অধ্যক্ষা বা পরিচালিকা ওদের উপর দৃষ্টি রাখতে পারেন।

এর পর যে স্কুলটি দেখতে গেলাম, তার অবস্থা আমাদেরই স্কুলের মত। জরাজীর্ণ বাড়ীর গোটাটা জুড়ে চলে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বাগ্‌দেবীর সাধনা। তবে তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা আর জিনিসপত্র দেখে মনে হোল, বাইরেটা যতই পুরনো হোক, ভিতরটা যথেষ্টই দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্যতা রাখে।

দৈহিক এবং মানসিক বিকলাঙ্গদের জন্য আছে নানারকম ব্যবস্থা এর পরের স্কুলটিতে। দুর্ঘটনায় আহত ছেলেটির দুইখানি হাতই কনুইয়ের কাছে পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়, তাকে প্রথমে একটি যন্ত্রের সহায়তায় এবং পরে স্বাধীনভাবে লিখতে শেখান হয়েছে। আমাদের সামনে ডান পায়ের দুই আংগুলের মাঝে পেন্সিল চেপে ধরে লিখে দেখাল তার নাম। এখানে আছে আরও নানারকম ছাত্র ছাত্রী। তারা কেউবা বিছানা থেকে উঠতে পারে না, কারোর বা একহাত কিংবা দু'হাত কাটা, কারোর অসহায়ত্ব অন্য রকমের। কিন্তু মাস্টারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তারা জীবনের সার্থকতা খুঁজছে পড়াশোনার থেকে।

মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ যে সব ছেলেমেয়েদের দেখা দেয় তারা পড়তে আসে এই স্কুলেরই আর এক অংশে। প্রথম, বাবা-মার কাছে থেকে মানসিক বিকৃতির কারণ বা অসুস্থতার বিবরণ নিয়ে এদের ভর্তি করে নিয়ে চিকিৎসা এবং শিক্ষাদান চলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। সেই প্রশ্নাবলীর মধ্যে প্রধান হ'ল—সাংসারিক ও পারিবারিক বর্তমান অবস্থা, দুর্ব্যবহারের (যদি থেকে থাকে) কারণ এবং বিবরণ, প্রাক্-স্কুল বয়সে কি ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল,

আর পারিবারিক বিস্তৃত ইতিহাস। যদিও এখানে 'থ্রি আর'-এর (লেখা, পড়া, আঁক কষা) সব রকম ব্যবস্থাই বর্তমান, যোগ্যতানুসারে এদের শ্রমসাধ্য কাজেও শিক্ষা দেওয়া হয়।

অনেকগুলো প্রশ্নোত্তরের বোঝায় বিব্রত হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। দেখা হোল সেখানে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সংগে। তারা এসেছেন ভিয়েনা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে সেণ্টপোল্টেন শহরের কারখানা থেকে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের ওদের কারখানায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে।

সম্বর্ধনা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। অথচ আমাদের দলের সবাই নানা কাজে ব্যস্ত; অগত্যা তাঁরা আমাকেই পাঠালেন। ভয়ে ভয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সংগে ছিলেন এক হাংগেরীয় ভদ্রমহিলা আর একজন অষ্ট্রিয়ান দোভাষী। টালী আর ইট তৈরীর কারখানা এটি, দক্ষ আর অদক্ষ উভয় রকম শ্রমিকই সেখানে কাজ করে। প্রত্যেকেই জানতে চাইল কিছু কিছু আমাদের দেশ সম্বন্ধে। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করল। ভয় ভেঙে যাচ্ছিল, কৌতূহলও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। বললাম, "আচ্ছা, তোমরা বেশ সুখে আছ এই কারখানাতে? তোমাদের ভাল লাগে কাজে আসতে?"

"আমাদের এই কারখানাটিকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, একদিন না আসতে পারলে মন কেমন করে।"

"তোমরা কি চাও তোমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে কাজ করুক?"

"আমাদের ছেলেমেয়েরা এই কারখানাকে বড় করতে সহায়তা করবে, এই আমরা চাই। কিন্তু আমরা চাইনা ওরাও আমাদের মত অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করুক। তাই আমরা ওদের দিকে চেয়ে

আছি—কবে আমাদের ছেলেমেয়েরা নিপুণ হাতে নেবে এই কারখানার ভার, আমরা পাব শান্তি আর বিশ্রাম।"

নাঃ, এরা দেখছি ভাবিয়ে তুললে! আমাদের দেশের কারখানা সম্বন্ধে খুব বেশী অভিজ্ঞতা নেই। তবে মজুরদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে কারখানার ভার নেবে, ভাবতেও একটু অবাক লাগে বৈকি।

এবার ওরা ধরে পড়ল—কিছু বলতে হবে। কি মুস্কিল! আমি কি নেতা না রাজনৈতিক কর্মী যে বক্তৃতা দেব। কাজেই জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা বল দেখি, তোমরা কি করে জানলে আমরা এসেছি তোমাদের দেশে।"

"কেন খবরের কাগজ পড়ে।'

"কি সর্বনাশ! তোমরা খবরের কাগজ পড়? তা সবাই মিলে বস আর শহর থেকে কেউ এসে পড়ে শোনায় বুঝি?"

"কেন, আমরা বুঝি পড়তে জানিনা? তোমাদের দেশের শ্রমিকরা পড়ে না বুঝি?"

"কি যে বল? পড়াশোনা করবে ভদ্রলোকের ছেলেরা! মুটে মজুররা পড়ে করবেই বা কি, আর সে বিলাসই বা ওদের কেন? কাজ করবে কারখানায়, ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্রে সে পদটা দিয়ে যাবে—লেখাপড়ার দরকারটা কোথায়? ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে—ও বেকার হবে। নিতান্ত ভাগ্য ভাল হলে করবে ৩০ টাকার মাস্টারী। তার থেকে মজুরের ছেলেরা ত অনেক ভাল আছে!"

"তোমাদের ছেলেমেয়েদের কথা শুনে ত ভয় হচ্ছে! ঐ স্বাধীনতা পেয়েও তোমাদের কি লাভ হোল জানিনা।"

এবার ওরা শুনতে চাইল হাংগেরীর খবর।

হাংগেরীয় প্রতিনিধি বললেন, "আমাদের দেশ সবে আমরা তৈরী করছি। ক্রমাগত আমরা গড়ে তুলছি স্কুল ছোটদের জন্য আর বড়দের জন্য। মাস্টার আর ডাক্তার হবার জন্য আমরা লোককে উৎসাহিত করি। আমাদের সুখী ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার জন্য তাদের যে প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে আসা মাত্র তাদের আমরা নিয়ে যাই কাজে লাগবার জন্য।"

গেলাম কারখানার ছেলেমেয়েদের 'রক্ষণাগার' দেখতে। এই কারখানায় খেটেখাওয়া মা-বাবার শিশুরা এখানে সারাদিন থাকে। রাত্রে মা-বাবা বাড়ী ফেরার সময় এদের নিয়ে যায়। এর খরচ বহন করেন কর্তৃপক্ষ, আর বেতন অনুযায়ী শ্রমিকদের মজুরীর একটা অংশ তাতে দিতে হয়। খুব বেশী প্রয়োজন হলে ছেলেমেয়েরা রাত্রেও থাকতে পারে, তবে বেডের সংখ্যা বর্তমানে ৫০টি মাত্র, পরে আরও বাড়ান হবে।

ছেলেমেয়েদের খাওয়া, শোওয়া, বসা, খেলা, পড়া আর রোগ সারাবার ব্যবস্থা সবই এখানে আছে। প্রকাণ্ড বাড়ী, দুধারে ফুলের বাগান, খেলার মাঠ, রান্নার ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার। প্রাক্-যুদ্ধযুগে এটি একটি রাজ-প্রাসাদ ছিল ; পরে দখল করে তৈরী করা হয়েছে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আবাসস্থল। সকালে এসেই শিশুরা জামাকাপড় বদলিয়ে মুক্ত আলোতে ড্রিল করার জন্য প্রস্তুত হয়। ঐ সময় তাদের এক কাপ করে দুধ দেওয়া হয়। তারপর লাইন করে পড়ার ঘরে এসে পড়াশোনা। তার জন্য আছেন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর দল। তাদের সযত্ন আর সস্নেহ অধ্যাপনায় অল্পদিনেই এরা শিখে ফেলে প্রাথমিক পাঠ্যগুলো। সাজান লাইব্রেরী, বিজ্ঞান-সম্মত ছোট গবেষণাগার, আর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির সাজ-

সরঞ্জাম থাকায় ছেলেরা আকৃষ্ট হয় সহজেই। শিশুদের কাজ করতে দিয়ে অধ্যাপকরা পর্যবেক্ষণ করেন সহিষ্ণু সতর্কতার সহিত। ছাত্ররা জানে যখন খুশী তখনই মাস্টার মশাই বা দিদিমণিরা এদের সাহায্য করতে ব্যস্ত। তাই লাঞ্চের আগে পর্যন্ত এরা কেউ বা প্লাস্টাসিনের মডেল তৈরী করে, কেউ বিরাট লাইব্রেরীটির সদ্ব্যবহার করে, আর কেউ বা খেলার ট্রেনগুলিকে ঘড়ঘড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে দেখে—ঠিক লাল আলো জ্বালার সংগেই স্টেশনে গাড়ীটা লাগল কিনা।

সাড়ে বারোটায় লাঞ্চের ছুটি। বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে তৈরী পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার পর বিশ্রাম। ঘণ্টাদুয়েক বিশ্রামের পর বড়রা করে পড়াশোনা, আর ছোটরা যায় মাঠে খেলতে। তিনটার সময় ছোটদের আবার দুধ, পাউরুটি, মাখন পরিবেষণ করা হয়। বড়রা এইবার তাদের চা, কফি, বা অন্য পানীয় আর কিছু খাবার খেয়ে খেলতে আসে। এই বড়রা কিন্তু সবাই ১৪ বছরের নীচে। কারণ ১৪।১৫ বছর বয়সে ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় শহরে কারিগরী বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য। সন্ধ্যার পর এরা বাড়ী ফিরে যায় পরদিন এখানে ফিরে আসার অদম্য আকাংক্ষা নিয়ে।

এই শিশুনিকেতনটির বিশেষত্ব হল—ছেলেমেয়েদের সুন্দর স্বাস্থ্য আর প্রাণচাঞ্চল্য। শিক্ষয়িত্রীর হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে একটি ৬ বছরের মেয়ে আমাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি এটা কি পরেছ? তোমাদের ছেলেমেয়েরা বুঝি এরকম পরে?' শিক্ষকমশাই ব্যস্ত হয়ে আমাকে বললেন—'তুমি আশা করি কিছু মনে করবে না। কাগজের মারফৎ আমরা ভারতের নামই শুধু শুনি, তার কোন অধিবাসীর সংগে পরিচয় হয়নি এখনও। তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা তোমার দেশ সম্বন্ধে ভয়ানক কৌতূহলী।' আবার প্রশ্ন করল আর একজন, 'তোমাদের

শিশুরা কি রকম স্কুলে পড়ে ? ওদের এরকম খেলার মাঠ আছে ?' মুখে বললাম, 'আছে বইকি ? ওরাও তোমাদেরই মত দুষ্টু আর পড়তে চায় না'—সমস্বরে প্রতিবাদ উঠল—'আমরা ভীষণ ভালবাসি পড়তে।'

চোখের সামনে ভেসে উঠল তিন শিফ্‌টে চালু স্কুলগুলিতে কয়েক-ঘণ্টার জন্য পড়তে আসা, বেতের ভয়ে কুঁকড়ে থাকা, ৮।১০ বছরের আমাদের নিরুপায় শিশুরা। ওদিকে তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলেছে, 'তোমার চুলগুলো কাটোনা কেন ?'—'আমাদের সংগে খেলবে ?'

সবুজ বনানীঘেরা এই শিশুনিকেতনে যারা পড়ে, খুশী আর স্বাস্থ্যে তারা ভরপুর—ওরা মজুরদের ছেলেমেয়ে—ভাবী নাগরিক ওরা নূতন সমাজের।

সুখে থাকুক, বেঁচে থাকুক ওরা। আমার দেশের শিশুরাও যেন পায় এমনি সুযোগ, সৌভাগ্য।

ভিয়েনার পথে পথে

ভিয়েনার দিকে যেদিন পা বাড়িয়েছিলাম, সেদিন মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি আমার এতদিনকার অভিজ্ঞতাকে এভাবে উল্‌টিয়ে দিয়ে নূতন পৃথিবীর দ্বার খুলে যাবে আমার সামনে। শিশু-সম্মেলনে আগত গোটা পৃথিবীর প্রতিনিধিদের সাদর সম্ভাষণ, আনন্দ-উপ্‌ছে-পড়া শিশুর দল, ভিয়েনাবাসীদের সস্নেহ আতিথেয়তা, পর্বতঘেরা অস্ট্রিয়ার হাস্যময়ী প্রকৃতি, আর উপকণ্ঠে আছ্‌ড়ে পড়া দানিয়ুব, এরা যেন সবাই অন্য জগতের, ঐ চতুঃশক্তিশাসিত অস্ট্রিয়ার নয়। ইউরোপের সংগীতের উৎস এই ভিয়েনা নগরী,—এইখানে বসেই বেঠোফেন, মোৎসার্ট, শবের্ট, ব্র্যাম তাঁদের সংগীত রচনা করে গিয়েছেন। ভিয়েনায় তখন সবে এসেছে বসন্তের সাড়া, দিকে দিকে

চেরী, আপেলের গাছে রঙীন মুকুলের সমারোহ, পার্কে পার্কে ফর্সাইথিয়া গাছের শাখায় লেগেছে আগুন, শহরের বাইরে পাহাড়-চূড়ায় কচি পাতায় লেগেছে মরশুম—হাঁ, ফাগুন জেগেছে বনে বনে, আর মনে মনে।

বহুদিন হোল (বোধহয় গত যুদ্ধের বিভীষিকা-ভরা দিনগুলির শুরু থেকেই) ভারতীয় মেয়ে আর ওদেশে যায়নি। ইতিমধ্যে যারা শিশু ছিল তাবা বড় হয়েছে; ভারতও পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে তথাকথিত স্বাধীনতার আস্বাদন পেয়েছে। ওদের মধ্যে যারা প্রাক্-যুদ্ধযুগে ছিল উৎসাহ আর উদ্দীপনায় উচ্ছল, তারা হিটলারী অত্যাচারের কল্যাণে অনেকেই পৌছেছে বার্ধক্যের সীমানায়। যারা কোনও ক্রমে জীইয়ে রেখেছে তাদের নিঃশেষিতপ্রায় উৎসাহ আর প্রাণচাঞ্চল্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সুখী ও সুস্থ সমাজগঠনের দায়িত্ব নিয়ে। তাই বিদেশী, বিশেষ করে ভারতীয় নারীর কাছে তাদের জিজ্ঞাস্য—"কি তোমরা ভাবছ বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে?—তোমরা ত রাজনৈতিক পরাধীনতার সংগে সামাজিক আর অর্থনৈতিক পরাধীনতাও ভোগ করে এসেছ এতকাল ধরে, নূতন পরিবর্তন কি তোমাদের গতানুগতিক জীবনধারাকে বদলে দিয়েছে—দেবে? নয়া চীনের নারী আজ যেমন করে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে সব শৃংখল, তেমনি করে তোমরাও কি হয়েছ বন্ধনমুক্ত? তোমরা যে এসেছ ভারতীয় নারীসমাজের প্রতিনিধি হয়ে, তোমরা কি এনেছ তোমাদের সমাজে নবজাগরণ? কেন, কোথায় তোমাদের বাধা? এখন ত আর তোমরা পরশাসনাধীন নও, তবে কোথায় তোমাদের বিঘ্ন?" কি করে আর কোন্ লজ্জায় বলব—ঐ যে রুমানিয়ার কৃষক-রমণী বসে আছেন তাদের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, আমাদের নব-

জাগরণে আমরা পারিনি আমাদের সাধারণ রমণীদের অমনি চোখ মেলে তাকানো শেখাতে। সাতশো বছরের পরাধীনতার গ্লানি আমরা বয়ে এনেছি আমাদের ভাবধারায় তাই নূতন যুগের সংঘাতে সমস্যার ঝুলি কেবলই বোঝাই হয়ে চলেছে, গ্রন্থির পর গ্রন্থি বেঁধে চলেছি শাপমোচনের চেষ্টায়। শিক্ষা আমাদের সমাজে সার্বজনীন নয়; আজও আমরা পারিনি বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ করাতে—যা নাকি ভারত ছাড়া সভ্য দেশে সর্বত্রই চলিত; পারিনি জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন করে চাষীদের জমি দিয়ে ওদের মেয়েদের একটু সুখের মুখ দেখাতে—স্বামীপুত্র নিয়ে যে-ঘর তারা বাঁধতে চায় তার স্থায়িত্বের তাই দেইনি নিশ্চয়তা। আর তারাই ত আমাদের শতকরা আশীটি বোন।

এমনি প্রশ্নোত্তরের সংঘাতে ভিয়েনাবাসীরা দিতে চেয়েছে উৎসাহ আর আশ্বাস। পথের মধ্যে আমাদের দেখতে পেলেই জিজ্ঞাসা করবে, "আমাদের একটু তোমার দেশের কথা শোনাবে?" ভাষা-সংকট তাতে অসুবিধা ঘটায় নি;—নিজেরাই খুঁজে বার করেছে দোভাষী। যুদ্ধের সময় অনেক ছেলেমেয়েই হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইংল্যাণ্ড বাস করেছিল, তাদের সাহায্যে চালিয়েছি কথাবার্তা।

এদেরই মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে—"আচ্ছা, তোমরা অন্য কোন ভাষা না শিখে ইংরাজী শেখ কেন?"

"ও যে আমাদের প্রভুদের ভাষা"—সহাস্যে জবাব দিই।

"এখন ত আর নয়; এবার জার্মান শেখ।"

তামাসা করে বলি—"তোমরা আমাদের প্রভু হও, তিন মাসে যদি না শিখে ফেলি—তাহলে আমার নাম বদলিয়ে একটা ভিয়েনীজ নাম দিয়ে দিও।"

কলহাস্তে মুখরিত হয়ে ওঠে রেস্তোরাঁ। তাড়াতাড়ি ওয়েটার এসে জিজ্ঞাসা করে, "কি ব্যাপার?"

বলি, "তোমাদের ভাষা শিখতে গিয়ে গলাটা শুকিয়ে ফেলেছি ; এক কাপ কফি দাও ত?"

দাম দেবার বেলায় কোন হাংগামা নেই। যে কোন একজন বলে ওঠে, "আরে তুমি আমাদের অতিথি—তায় ভারতীয় মেয়ে। না হয় খাওয়ালামই তোমায় এক কাপ কফি—"

ধন্যবাদ দিয়ে বলি, "তোমরা'ত আচ্ছা চালাক, বাড়ী নিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়ানোর বুঝি সাহস নেই।"

ইতিমধ্যে কয়েকবারই অবশ্য বন্ধুরা নানারকম ভিয়েনীজ রান্না বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাইয়েছেন।

এক রবিবারে গেলাম এক নবপরিচিত বন্ধুর বাড়ি। তাদের পরিবারের বিস্তৃত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হল। ২৪ ঘণ্টার নোটিশে অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ড চলে যান গোটা পরিবারটি। বাড়ির কর্তা ধরা পড়েন হিটলারের নাৎসীবাহিনীর হাতে। ৭ বৎসর পর ওদের হাত থেকে প্রাণটুকু মাত্র নিয়ে পালিয়ে যান সাংহাই। ছেলেরা তখন সবাই শিশুমাত্র; কেউ বা সবে যৌবনে পা দিয়েছে। মেয়েরা কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর এই পরিবারটি মাত্র ১ বৎসর পূর্বে আবার মিলিত হয়েছে ভিয়েনায়। দীর্ঘ বিচ্ছেদ আর অমানুষিক দুঃখ ভোগের পর সবে এরা একটু সুখের মুখ দেখেছে। এই পরিবারটি আমাকে কন্যাস্নেহে আদরযত্ন করে নানা বন্ধু-বান্ধবদের সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন; সহায়তা করেছেন আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার। ভিয়েনার প্রাক্‌যুদ্ধযুগের সহৃদয়তার

পরিচয় পেয়েছি এদের কাছে। শুনেছি যুদ্ধ যেমন আমাদের সমাজের ঘটিয়েছে পরিবর্তন,—গৃহবিবাদ আর দেশব্যবচ্ছেদ যেমন নাড়া দিয়েছে আমাদের সমাজের মূল ধরে সবেগে,—ভিয়েনাতেও তেমনি ঘটেছে মহাপ্রলয়। হিটলারী শাসন থেকে সোভিয়েট-বাহিনী মুক্ত করেছিল বেঠোফেন, মোৎসার্ট আর শবের্ট-এর স্বপ্নপুরীকে ১০ই এপ্রিল ১৯৪৫ সালে। তার স্মৃতি সগৌরবে পালন করে ভিয়েনাবাসী—আর তারই সংগে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাদের মাতৃ-ভূমির দিকে চেয়ে। এটা "মার্কিন-মহল্লা"--ওটা "ইংরেজ-অধ্যুষিত", —এধারে "ফরাসী-অঞ্চল",—ওধারটা "সোভিয়েট রক্ষণাধীন" এবং প্রত্যেক এলেকায় তারই সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে আচার-ব্যবহারে, বিপণি-সজ্জায় আর পাহারাপদ্ধতিতে। সীমানা-নির্ধারক তদন্ত কমিশন নেই,—নেই পাশপোর্ট তদারকের অনাবশ্যক কড়াকড়ি; তথাপি সোভিয়েট-অঞ্চলের বাসিন্দা মাকিন অঞ্চলে গেলে স্বস্তি পায় না; আমেরিকান নাগরিক রুশ এলাকায় এলে পালাতে পথ পায় না। সংগীন উঁচানো মার্কিনী জংগী সেনাবাহিনীর দিকে চেয়ে মনে পড়ে রণতাণ্ডবকালীন ভারতের অবস্থা। বাড়ীর দেয়ালে, রাস্তায়, গ্যাস-পোস্টে, জরাজীর্ণ ট্রামের পিছন দিকে, বড় বড় হোটেলের অস্বস্তিজনক কোণে, নিপুণহাতের দৃঢ়-অক্ষরে লেখা—Ami Go Home "মার্কিনগণ, দেশে ফিরিয়া যাও।" এটা ভিয়েনারই ছেলেমেয়েদের কীর্তি। কিন্তু এর বিপরীত অর্থাৎ "রাশিয়ানরা এদেশ ছাড়"—দেখলাম না। ইংরাজ-ফরাসীকে অবশ্য মার্কিনের লেজুড়ই মনে করে, তাদের উল্লেখ তাই বোধহয় নিষ্প্রয়োজন। যাই হোক্‌, এ সবে মনে হোল—এই কয়দিনেই (অন্যত্রও যেমন) মার্কিন-শাসনের স্বরূপ সাধারণ লোকের কাছে ধরা পড়েছে। ভিয়েনার শৃংখল-মুক্তির

স্মরণদিবসে সহস্র সহস্র বালক-বৃদ্ধা আর যুবক-যুবতীর যে মিছিল দেখেছিলাম তাঁতেও প্রধান স্লোগান ছিল—Ami Go Home। চতুঃশক্তিশাসিত ভিয়েনার অন্যতম মার্কিন-হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষকণ্ঠে তাদের প্রিয় সুরে গান ধরল—"আমি গো হোম"। এ সাহস ওরা পেল কোথায়?

এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা তোমাদের যুব-সমাজের কথা কিছু বল—ওরা কি রকম, কি করে? সমাজ আর নীতিবোধ ওদের কি ধরণের, আমাদের কিছু শোনাও ত?" নিজেরই অজান্তে কানের কাছটা গরম হয়ে এল—"কি সর্বনাশ! যুবক-যুবতীর কথা বলব? তাও নীতিবোধ সম্বন্ধে! ওকথা যে আমাদের উচ্চারণ করাও পাপ!" তাই প্রশ্নটা আর একটু পরিষ্কার করে নেবার জন্য বললাম—"ঐ সমাজটা পৃথিবীর সবদেশেই এক। কিছুটা প্রগতিশীল, কিছুটা রক্ষণশীল; আর দুইয়ের মাঝখানে পথ খোঁজার চেষ্টায় বিব্রত।"

ভদ্রলোক মৃদু হাস্যে বললেন—"তুমি প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ। ভারতবর্ষে কি যুদ্ধের ফলে সাধারণ নৈতিক জীবনের অধঃপতন ঘটে নি? তোমাদের নূতন-পাওয়া বন্ধুদের আদর্শে কি তোমাদের জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটে নি? তাই যদি হয়, তোমরা কিভাবে সেগুলো গ্রহণ করেছ? তোমাদের সমাজের প্রাচীন বর্ণাশ্রম আর সনাতন রক্ষণশীলতায় ফিরে গিয়ে শম্বুকের মত নিদ্রাগত হয়েছ, না, পৃথিবীর সংগে তাল রেখে নূতনতর সমাজের আদর্শ গ্রহণ করেছ? এই যেমন ধর আমাদের দেশে—একদল মনে করে আমরা মুক্ত, আর হিটলারী অত্যাচার যখন নেই তখন 'নগদ যা পাও ভোগ করে নাও'—বিদেশী-শাসকের গুপ্তচরবৃত্তি দ্বারা প্রচুর পয়সা উপায় করে নারী আর সুরার

আকর্ষণকেই মনে করেছে চরম মোক্ষের পরিণতি। আর একদল মেয়েও পরিশ্রম-বিমুখ হয়ে বিদেশী সৈনিকের লালসার ইন্ধন জুগিয়ে উপায় করছে প্রচুর অর্থ। খেটে-খাওয়া নর-নারীর দল পারবে কেন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে? তাই সমাজের মান ক্রমশঃই নেমে যাচ্ছে; সভ্যতা আর শিক্ষার কুদিকটাই আজ সমাজে পেয়েছে গৌরবের আসন। ওরা ভেবেছে যুদ্ধ ত এল বলে—রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব; অতএব কেন এই মিথ্যে নীতিবোধ আর রুচি নিয়ে টানাটানি?"

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমারও কি এই মত? তোমরা কি চিন্তা করছ? তোমাদের মাতৃভূমির ঐতিহ্যকে কি অমনি করে ধূলোয় লুটিয়ে দেবে? তোমাদের কাছ থেকে আমরা কি কিছুই শিক্ষা পাব না?"

চিন্তিত মুখে বলে চললেন, "ভেবো না এরাই আমাদের সমাজের সব। আমরা ত একেবারে ভেসে যাইনি এখনও। আর নিশ্চয়ই এরই জন্যে মরণপণ করে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। তবে আমাদের যুঝ্‌তে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির সংগে। আর সেজন্যই হয়ত আমাদের শক্তিও চাই বেশী। ন্যায় আমাদের পক্ষে, জয় আমাদের হবেই। যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করে দেশে আমরা ছড়িয়ে দেব শান্তির বাণী। আমাদের মায়েরা আর হারাবে না সন্তান, স্ত্রীরা হারাবে না স্বামী, শিশুরা থাকবে না আণবিক বোমার ভয়ে কুঁকড়ে। আমাদের পাশে তোমরা এসে দাঁড়াও। তোমাদের আমাদের মিলিত প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে আমরা আন্‌ব শান্তি,—মহামৈত্রীর পথে থাকবে না কোন বাধা-নিষেধ।"

কথায় কথায় রাত বেড়ে যাচ্ছিল; হোটেলে ফেরার পথে দু'জনেই

একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। উল্‌টিয়ে গেলাম স্মৃতির পাতা। ...এই ভিয়েনার পুরনো রেস্তোরাঁর আনাচে-কানাচে ঘুরে মরছে বেঠোফেনের সুরধ্বনি—গভীর নিশীথের বুক চিরে তারা যেন আর্তনাদ করে উঠল। মোৎসার্ট-এর সংগীতলহরী ছাপিয়ে ভেসে উঠ্‌ল কালো পোষাক-পরা ছায়ামূর্তির কণ্ঠস্বর—"এই অন্ত্যেষ্টি-সংগীতটি তোমায় লিখে দিতেই হবে, না হলে তোমার নিস্তার নেই।" আনন্দচঞ্চল গীতিমুখর ভিয়েনার যুবক-যুবতীর তালে তালে ওয়াল্‌জ্‌ আর পোলকানৃত্য—সারা ইউরোপ যাদের আমদানী করে গর্বিত,—তারা আজ ম্লান হয়ে গিয়েছে রাইফেল আর বেয়নেটের মার্চের তলায়। ভিয়েনা, তোমার এই দুঃখভরা রাত্রি কি নব-জাগরণের পূর্বাভাস সূচনা করছে? দুঃসহ বেদনার পরিসমাপ্তি হবে কি নবজাতকের প্রাণস্পন্দনে?

জিজ্ঞাসা নয়, আশ্বাস দিয়েই গেল ভারতবর্ষের মেয়ে তোমাকে তার প্রণাম নিবেদন করে।

বিদায়ের বেলা

দেশে ফেরার সময় হয়ে এল। যথারীতি বিদায়ভোজেরও আয়োজন হোল। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিষ্ঠান "লণ্ডন-মজলিসের" মিলনীসভায় সেদিন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে (যেমন আমাদের চিরাচরিত প্রথা) ভাগ হয়ে গেলাম ছোট ছোট দলে। খাবারের সংগে চলল মুখরোচক আলোচনা। একটি পাঞ্জাবী মেয়ে জিজ্ঞেস করল,—"কেমন লাগল এদেশের সুখ-সুবিধাগুলো ?"

বললাম,—"বিশেষ করে, সাংসারিক সুবিধাগুলো আমার ত বেশ ভালই লাগছে—রান্না, রান্নাঘর, সুশৃঙ্খল ঘর-কন্না।"

পাশ থেকে এক বাঙালী ভদ্রলোক বললেন—"মেয়েদের নিয়ে মহামুস্কিল ! যেখানে যাবে খালি সংসারের কথা।"

"কি আর করি বলুন ! রাজা রামমোহন রায়ের আমল থেকে আপনারা এদেশে আসছেন—আপনাদের হ্যাট-টাই-কোট আর আবহাওয়ার গল্প পুরনো হ'য়ে গিয়েছে। কাজেই আপনাদের যা চোখে পড়ে নি—সেই গ্যাসকুকার আর রেফ্রিজারেটর বসানো রান্নাঘর, পথচলা মেয়েদের নানা সুবিধার দিকটা, সাংসারিক কাজে পুরুষের সহায়তা—যদি চোখেই পড়ে যায় জানবেন ওটা আমাদের মানুষের স্বভাব—যার যার সুবিধার দিকটা সবারই চোখে পড়ে আগে। তার জন্য দোষ দিতে পারেন না।"

"আর কিছুই কি উল্লেখযোগ্য নেই ?"—বললেন এক ব্রিটিশ মহিলা।

"আছে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের দিকটা।"

আশান্বিত হয়ে বললেন ডাক্তার আবার,—"আপনারাও ত অনেকে চাকুরী করছেন আজকাল।"

"করছি বৈকি!—তবে অর্থনৈতিক চাপে আপনারা যখন চরম দুর্দশায় পড়েছেন। আসলে সেই যুদ্ধের আমল থেকে কিছু মেয়ে আমাদের দেশে কাজে ঢুকেছেন। এখনো তা প্রায় রাজনীতি চর্চার মত—পরের স্ত্রী-কন্যা নামলেই বাহবা দিই, নিজের স্ত্রী-কন্যা নামলেই "ঘর ভাঙ্‌লো" বলে মাথা চাপড়ে মরি।"

প্রচুর হাসির সংগে জিজ্ঞেস করল পোলিশ ছাত্রী,—"ছেলেমেয়ের চিরন্তন কলহটা তোমাদের দেশেও আছে দেখ্‌ছি।"

জবাব দিলাম হাস্‌তে হাস্‌তে—"আমাদের মনু পরাশর বল্লাল-সেনের দেশ কি না তাই সব সনাতন, ঝগড়াটাও; তোমাদের থেকে ঝগড়াটাও আমাদের অনেক বেশী। ছেলেরা মনে করে আমাদের অনেক বেশী সুবিধা দিয়ে ফেলেছে আগেকার যুগের তুলনায়, অতএব তারা প্রশংসার পাত্র। আর আমরা তোমাদের দেখে মনে করি—আমরা তোমাদের চেয়ে কম কিসে যে চিরকাল বঞ্চিত হয়ে থাকব? তাই আমরা পুরুষজাতির কাছে কৃতজ্ঞ হব কি জন্য তা বুঝে উঠতে পারি না। বিদেশের খানা-পোষাক যাঁরা স্বদেশে আমদানী করে কায়দামাফিক গ্রহণ করেন, তাঁরা কেন বিদেশের রান্নাঘরের গ্যাস ও শৃঙ্খলা স্বদেশের রান্নাঘরে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত?"

এবার জবাব দিলেন বিদায়ী সভ্য—"সবাই ত আর এক রকম নয়। ইচ্ছা আমাদেরও হয়। তবে কি জানেন দেশ আমাদের এখনও সে পর্যায়ে আসে নি যে, ঐ সুবিধাগুলো আমদানী করলে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করবে।"

পাঁচ বছর লণ্ডনপ্রবাসী বাঙালী ভদ্রমহিলা বললেন, "ঠিক তাই, আমরা এখনও উপযুক্ত হইনি বলে স্বাধীনতা পেতে পারি না।"

ডাক্তারের বন্ধু এবার প্রশ্ন করলেন অবলাকে—"গাল ত বেশ দিয়ে দিলেন। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম দুই গোলার্ধের চাল-চলন ত আর একরকম হতে পারে না, একথা ত মানেন ?"

"মানি বৈকি! স্বয়ং কিপ্‌লিং বলে গিয়েছেন, না মেনে উপায় কি? আর ভাগ্যিস ঐ দুটো গোলার্ধ পৃথিবীর দু'দিকে অবস্থিত ছিল, না হলে কার দোহাই দিতেন? পূর্ব-পশ্চিম দুই ঐতিহ্যের বৈপরীত্যের দোহাই দিয়েই ত আমরা চিরকাল চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরেছি। তাই আমাদের মেয়েদের সকাল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অন্দরে চরকিপাক্ ঘোরাও শেষ হয় না, ছেলেমেয়েদের উপার্জনের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয় না আর সাতপাকে বাঁধন দেওয়া বিয়ে উল্টো দিকে চোদ্দপাক ঘুরলেও খোলে না।"

"সে খোলার ব্যবস্থা ত শুনেছি শীগরিই হবে ; তাতে কি খুব একটা সুবিধা হবে? দেখুন না আমেরিকায় কি অসংখ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে। কেউ কি সেখানে সুখে আছে?"

"তা বটে, দেশ ত পৃথিবীতে ঐ একটাই আছে। তাও ত সেখানকার সাধারণ ছেলেমেয়েদের খবরটা আমরা রাখি না। তবে কি জানেন—ঐ বিবাহবিচ্ছেদটা হল নিষিদ্ধ ফল ; হাতে এলেই দাম কমে যাবে। দেখুন না কেন, বিধবাবিবাহ বিল বিদ্যাসাগর মশায় এত কষ্টে পাশ করালেন ; তা কাগজে-কলমেই রেখে দিলাম শ'খানেক বৎসর। সংগতিপন্ন না হলে আবার-বিয়ে-করা বিধবাকে আমরা কোণঠাসা করেই রাখি। বিলটা পাশ হয়ে গেছে কিনা—আর মাথাব্যথা নেই।"

পিছন থেকে টিপ্পনী কাটলেন নবাগত বিমানচালক—"এখন ত খুব বলছেন, দেশে ফিরে গিয়ে দেখব কতখানি সুবিধা করেছেন।"

ভদ্রলোকের হাতের হীরের আংটিটার দিকে চেয়ে জবাব দিলাম, "যদি ভাল একটি চাকুরী, একটি কোয়ার্টার, গোটা চারপাঁচ চাকর-খানসামা নিয়ে আরাম করে বসতে পারি, তাহলে আর ভাবনা কি? এখন যা বলে গেলাম, তখন তা আর ভুলেও উচ্চারণ করব না। কোনরকমে সমাজের চূড়ায় ওঠাই ত লক্ষ্য; আর তা না হলেই এসব প্রশ্ন ও অসন্তোষ দেখা দেবে।"

নার্সিং-পাঠরতা "লণ্ডন-মজলিশে"র গুজরাতী সেক্রেটারী বললেন, "আঃ! কি যে খালি যাবার সময় ঝগড়া করছ! ভাল লাগে না বাপু, তোমরা দেশে ফিরে গেলে! আমরা কবে যে ফিরব!"

জাতে আমরা বাঙালী, যাবার কথা মনে করিয়ে দিতেই ঝগড়া করে শুকিয়ে-আসা গলার কাছটা ভারী হয়ে এল। বললাম—"এত হাঁফিয়ে উঠলে চলবে কেন? সাফল্য নিয়ে ফিরে এসো, প্রতিকূল আবহাওয়ার সংগে লড়াই করে আনতে হবে জয়। শক্তিসামর্থ্য সঞ্চয় করে তৈরী হও, আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করবো তোমাদের জন্য।"

সহাস্যে মন্তব্য করলেন পোলিশ মহিলা—"তোমাদের ছেলেরা নিশ্চয় আতংকিত হয়ে উঠছে।"

"হবার ত' কথাই"—জবাব দিলাম হাসতে হাসতে।